দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ২৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৪।।
১১ ফাল্গুন - ১৪২০।। website : www.eswastika.com

জামায়াত-বিএনপি'র পাশে মমতা?

'পুরনো হিসেব নিকেশের পদ্ধতি এবার নস্যাৎ হয়ে যাবে'— অমিত শাহ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সোস্যাল নেটওয়ার্কে টি এম সি-র নয়া নাম টোট্যাল মুসলিম কংগ্রেস □ গূঢ়পুরুষ □ ৯

খোলা চিঠি : ক্ষমতার আঙুর টক, পালালেন কেজরিওয়াল □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

সুবিধাবাদের রাজনীতি □ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

ভারতবাসীর ভাষা □ রমাপ্রসাদ দত্ত □ ১৪

বড় ভাষাগুলি ছোট ভাষার গলা চেপে ধরবে □ তারক সাহা □ ১৬

জামায়াত-বিএনপি-র পাশে মমতা? □ ১৭

অরবিন্দ জননী স্বর্ণলতা দেবী □ রূপশ্রী দত্ত □ ২১

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগের নূতন ধারা □ ডঃ প্রণব রায় □ ২২

সংস্কৃত সাহিত্যে চৌষট্টি কলা □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২৩

একছুটে প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে ভেসে যেতে হবে □ এম জে আকবর □ ২৭

"নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক পুরনো হিসেব নিকেশের পদ্ধতিই এবার নস্যাৎ হয়ে যাবে"— অমিত শাহ □ ২৯

হিন্দু কণ্ঠস্বর শোনা যায় না □ অমলেশ মিশ্র □ ৩১

আপনার একটি ভোট দেশের জন্য, আপনার একটি ভোট পরিবর্তনের জন্য □ ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ সুস্বাস্থ্য : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ চিত্রকথা : ৩৮ □ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ২৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাংলাদেশ কি হিন্দু উচ্ছেদের পথে?

বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন, অত্যাচার, খুন-ধর্ষণ, লুঠ প্রভৃতি ঘটনাগুলি নিয়মিত ঘটে চলেছে, কারণ সেদেশের মুসলমান নেতৃত্ব কখনোই চায়নি বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো হিন্দুরা মর্যাদা এবং অধিকারের সঙ্গে বসবাস করুক। তাই হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদের ভু-সম্পত্তি দখল করে তাদের দেশছাড়া করা। বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে না প্রায় কোনও দলই। তাহলে বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা কোথায়? এই নিয়েই আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়। লিখেছেন বিমল প্রামাণিক।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র। সত্বর কপি বুক করুন।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

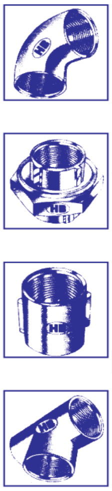

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জামায়েতে জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ

যুদ্ধাপরাধী জামায়েতে ইসলামির জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় না দিতে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাইয়াছেন বাংলাদেশের সরকারি দলের নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের পর সেই দেশের যৌথবাহিনী ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিলে জামায়েতে জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতেছে। অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গে যাঁহার সহায়তা পাইতেছে তিনি হইলেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত রাজ্যসভা সদস্য আহমেদ হাসান ইমরান। যিনি আবার বাংলাদেশে জামায়েতের পত্রিকা দৈনিক 'নয়া দিগন্ত'র কলকাতা প্রতিনিধি। এই রাজ্যের এক সাংসদ অন্য রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী জঙ্গিদের আশ্রয় দিতেছেন অভিযোগটি সত্য হইলে এই দেশের পক্ষেও তাহা ভয়াবহতার কারণ। কারণ ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই ইসলামী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হইয়াছে। সম্প্রতি আলকায়দার বর্তমান নেতা আরমান আল জাওয়াহিরি বাংলাদেশে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়াছে। বাংলাদেশ সরকারকে অভিহিত করা হইয়াছে 'ধর্মনিরপেক্ষ সরকার' হিসাবে। এই অবস্থার জন্য ভারতবর্ষ ও তাহার দালালদের দায়ী করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নাই। কোনো মুসলমানও ধর্মনিরপেক্ষ নহে। ধর্মনিরপেক্ষ হইলে সে আর মুসলমান থাকিতে পারে না। তবুও কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইতেছে মুসলমান তোষণ। আজ আবার সন্ত্রাসী ইসলামি জঙ্গিদেরও তোষণ করা শুরু হইয়াছে। কেবল সংখ্যালঘু ভোটের লোভে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অচিরেই দেশে চরম বিপদ দেখা দিতে বাধ্য। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ বলিলেও ইসলামি জঙ্গিদের সম্পর্কে তাঁহার নীরবতা লক্ষণীয়। দেগঙ্গা, ক্যানিং, হাওড়া, নলিয়াখালির দাঙ্গা কিসের ইঙ্গিত? এই দাঙ্গায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা পক্ষপাতশূন্য ছিল না। তবুও এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ এবং মোদী দাঙ্গাবাজ!

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে সংখ্যালঘুদের দুর্দশায় ব্যথিত হন কিন্তু কয়েক কিলোমিটার দূরের সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের দুর্দশায় ব্যথিত হন না। যদিও সেইখানে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের উপর নিত্য হামলা চলিতেছে। অপহরণ, বলাৎকার, জোরজবরদস্তি বিবাহ, হত্যা ও ধর্মস্থান ধ্বংস করা এইসব অত্যাচার বাংলাদেশী বাঙালি ঘোষ, বোস, ব্যানার্জি, মুখার্জিদের নিত্য জীবনের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই রাজ্যের সরকার ওই অত্যাচারী নরপশুদের সহায়তা করিতেছে। হাজার হাজার বাঙালির প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংস করা কেবল ওই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া উপেক্ষা করা যাইবে কি? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সহযোগিতা দিতে পারিলে আজ তাহা নয় কেন? আজ সব থেকে আশঙ্কার কথা হইতেছে রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় চিটফান্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ জেহাদি কার্যকলাপেও ব্যবহৃত হইতেছে। বাংলাদেশের জামায়েতে ইসলামি জঙ্গিদের আর্থিক সহায়তা করিতে মুর্শিদাবাদ ও মালদহতেও ক্যাম্প করা হইতেছে। কেবল ভোটের লালসায় ইসলামের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্টরা সবাই একই পথের পথিক, অথচ বাংলাদেশী সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় তাহারা নিশ্চুপ। এই জন্য দেশভাগের এত বৎসর পরেও সেদেশ হইতে নিপীড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় লইবার ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন ঘটিয়া চলিতেছে। আর ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হইয়া শরণার্থী হিসাবে আশ্রিত হিন্দুদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলিয়া দায় দায়িত্ব এড়াইয়াছেন রাজনীতিকরা।

এই মুহূর্তে দেশের পররাষ্ট্রনীতি শক্তসামর্থ্য নয় বলিয়াই এমন নানা ঘটনা ঘটিতেছে। শক্তিশালী ভারত এবং সেই দেশের সরকার কঠোর হইলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রদ করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলিয়া ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসকেই লালন পালন করা হইতেছে ভোটের লালসায়। পশ্চিমবঙ্গ তাহার ব্যতিক্রম নহে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।

আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্র যতই দাবি করুক না কেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কোনও অনুপ্রবেশ হয়নি; সরকারের এহেন দাবির অসারত্ব প্রমাণ করে সেনাপ্রধান জেনারেল বিক্রম সিং একপ্রকার সরকারি অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বীকার করে নিলেন যে বিষয়টি ‘গভীর উদ্বেগে’র এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপদ। নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি চিন্তাশীল গোষ্ঠী আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল সিং বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসনের সমস্যা উত্তর-পূর্ব ভারতের জনবিন্যাসের বিপুল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যার ফলে অসমের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে পড়েছে।’ গত ১১ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত ‘বর্ডার অ্যান্ড নকশাল ম্যানেজমেন্ট’ শীর্ষক এক আলোচনা-চক্রে একথাগুলি বলেন তিনি। তিনি এও বলেন যে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিধান থেকে অবশ্যই সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু অবৈধ অভিবাসনের বিষয়ে দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সেনাপ্রধান।

শ্রী সিং ভারতের পূর্ব-সীমান্তের অনুপ্রবেশ-জনিত গুরুতর সমস্যাটি তুলে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের পশ্চিম সীমান্তের বিপদের উল্লেখ করতেও ভোলেননি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, গত এক বছরে দেশের পশ্চিমসীমান্তে রেকর্ড-সংখ্যক গোলা-বর্ষণ করে যুদ্ধবিরোধী চুক্তি ভঙ্গ করেছে পাকিস্তান। তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্তে নিজেদের সামরিক উপস্থিতির স্বপক্ষে প্রমাণ রাখতে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস জারি রাখতে চায় ইসলামাবাদ। তাঁর বক্তব্য : ‘২০০৩-এ স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি মোটামুটি ঠিকই চলছিল। কিন্তু গত বছরই অকস্মাৎ দেখা গেল যে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তে সেনা উপস্থিতি বজায় রাখতে উপত্যকায় সন্ত্রাস জারি করতেই এটা করা হয়েছে।’ একইসঙ্গে তিনি এও জানান যে এর প্রত্যুত্তরও ভারত ভালোভাবেই পাকিস্তানকে দিয়েছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন যে যতদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবা বা অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলির যোগসাজশ বজায় থাকবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এরা আর্থিক সাহায্য পাবে, ততদিন এদেশের সেনাবাহিনীকে যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জেনারেল সিং সঠিকভাবেই এই বিষয়টির দিকে আঙুল তোলেন যে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্পের সুযোগ নিয়ে নেপাল হয়ে প্রাক্তন জঙ্গিরা কাশ্মীর উপত্যকায় ফিরে যাবার সুবিধা পাচ্ছে। সেনাপ্রধান বলেন, ‘প্রাক্তন কাশ্মীরি জঙ্গিদের নেপালের রাস্তা ব্যবহার করে উপত্যকায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তার। যদিও বিষয়টি এমনভাবে দেখানো হচ্ছে যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জিনিসটা এমনও হতে পারে যে তারা আত্মঘাতী বাহিনীতে যোগ দিয়ে পুনরায় জঙ্গি কাজে সক্রিয় হয়ে পড়লো। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

সব মিলিয়ে অন্তত নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেশের বর্তমান সেনাপ্রধানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ওই আলোচনা চক্রে চোখে আঙুল দিয়ে ধরা পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির তোষণ নীতি এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে আরও প্রকট করেছে বলে তাঁদের অভিমত।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন।

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

সংবাদ প্রতিবেদন

উপজাতির শংসাপত্র হাতে পেয়ে দারুণ খুশি অসুররা

বাসুদেব পাল : শিলিগুড়ি॥ অবশেষে তপসিলি উপজাতির শংসাপত্র হাতে পেলেন জলপাইগুড়ি জেলার ক্যারন চা বাগানের অসুর সম্প্রদায়ের একদল শ্রমিক। কয়েক দশকের এই দাবি গত ১১ ফেব্রুয়ারি পূরণ হওয়ায় ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন পিছিয়ে পড়া আদিম এই জনজাতির মানুষ। এদিন ব্লক উন্নয়ন দপ্তরে বাগানটির অসুর সম্প্রদায়ের একচল্লিশ জন শ্রমিকের হাতে ওই শংসাপত্র তুলে দেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি প্রিয়া ছেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মালবাজারে জনজাতিদের সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আসার আগেই সরকারি শংসাপত্র পেয়ে দারুণ খুশি শ্রমিকরা।

উপজাতি শংসাপত্র হাতে পেয়ে দারুণ খুশি অসুররা।

ক্যারনের অসুর সমাজ সূত্রেই জানা গেছে, আদিম জনজাতির মানুষ হলেও এতদিন তাদের কোনো সরকারি স্বীকৃতি ছিল না। তপসিলি উপজাতির শংসাপত্রের জন্য দীর্ঘদিন নানা মহলে আবেদন করেও কোনো ফল মেলেনি। ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে এই বিষয়টি নিয়ে অসুরদের প্রতিনিধিরা ক্যারন চা বাগানের ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বোসের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ির তৎকালীন জেলাশাসক স্মারকি মহাপাত্রের কাছে দরবার করেন। জেলাশাসক সে সময় মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর বাগানের মোট ১১০ জন অসুর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক শংসাপত্রের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে এদের ৪১ জনের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বাকি আনেবদনকারীদের হাতেও দ্রুত তা তুলে দেওয়া হবে বলে মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ভুটান সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত ক্যারন চা বাগানে প্রায় সাড়ে তিনশো অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

৭০ বছর বয়সে উপজাতির স্বীকৃতি পেয়ে এদিন উচ্ছ্বাস গোপন করেননি বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক মোংরা অসুর। বঞ্চনার অবসানের আনন্দে জল এসে গিয়েছিল শংসাপত্র পাওয়া বছর পঞ্চাশের পাকলু অসুর, ষাট বছরের বিষ্ণু অসুরদের চোখে। বেজায় খুশি হয়েছেন এতোয়া অসুর, ডোমিনা অসুর, সালমি অসুর, মীনা অসুরদের মতো মধ্যবয়সি শ্রমিকরাও। বেশ কয়েকজন অসুর ছাত্রছাত্রীও এদিনের শংসাপত্র প্রাপকদের দলে ছিলেন।

ক্যারনের অসুর সমাজ সেবা সমিতির সম্পাদক সন্তোষ অসুর বলেন, এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এজন্য আমরা ব্লক ও মহকুমা প্রশাসন থেকে শুরু করে বাগানের ম্যানেজারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় আগামী দোলে আমরা বাগানে জমায়েতের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব পালন করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি প্রিয়া ছেত্রী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ব্লক পরিদর্শক সমীরকুমার রায় বলেন, এখন থেকে অসুরদের তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র পেতে আর কোনো অসুবিধা হবে না। উপকৃত হবেন অসুর সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম।

শংসাপত্র না থাকায় এতদিন অসুররা সরকারি বৃত্তি থেকে শুরু করে শিক্ষা, অনুদান, বার্ধক্যভাতা, ঋণ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

ভোটের মুখে বরাদ্দ বৃদ্ধির কংগ্রেসী ভাঁওতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত দশ বছরে দেশের গ্রাম আমূল বদলে প্রায় শহরের সুবিধাযুক্ত হয়ে গেছে বলে কেন্দ্র যতই ঢক্কানিনাদ করুক না কেন, তা যে কতটা অসার তা প্রমাণ হয়ে গেল অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের চার মাসের অন্তর্বর্তী বাজেটে। পঞ্চায়েতি রাজে একধাক্কায় সাতশো গুণেরও বেশি বরাদ্দ বৃদ্ধি করে এ নিয়ে প্রবল বিতর্কের মুখে এখন তিনি। ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে যেখানে এইখাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র দশ কোটি, ২০১৩-১৪-য় তাই বেড়ে হয়েছে সাত হাজার এক কোটি টাকা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ব্যাখ্যা, গত দশবছরে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার আসলে ডাহা ফেল। তাই ভোটের আগে একদিকে রাজীব আবাস যোজনার মত কিছু ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের সম্ভাবনাসম্পন্ন প্রকল্পের খুড়োর কল ঝুলিয়ে, অন্যদিকে গত দশ বছরে গ্রামের চেহারা কেমন আমূল পাল্টেছে তা নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে কারণে পরিকল্পনা খাতেও বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ ৯১.৮ গুণ। ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে এ বিষয়ে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮৮ কোটি টাকা, চলতি আর্থিক বছরে তা বেড়ে ৮,০৮২ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সত্যিই যদি বিগত দশ বছরে সবকিছু পাল্টে যেত তাহলে পঞ্চায়েতি রাজকে এতটা ক্ষমতায়নের দরকার হোত না। পাশাপাশি গ্রামোন্নয়ন খাতেও ৫.৪ গুণ বরাদ্দ ১৩,৮৮৫ কোটি টাকা থেকে ২০১৩-১৪ মরসুমে তা ৭৪,৪৭৮ কোটি ছুঁয়েছে।

দেশবাসীর চোখকে ফাঁকি দিতে এই মুহূর্তে কংগ্রেস যে কতটা মরিয়া তা বরাদ্দ বৃদ্ধির তালিকাতেই স্পষ্ট মালুম হচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের মানুষের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে তিনটি জিনিসের সর্বাধিক প্রয়োজন অর্থাৎ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য তা সেই তালিকায় যথাক্রমে দ্বাদশ, সতেরোতম এবং আঠেরোতম স্থান লাভ করেছে। চারদিকে একের পর এক স্কুল গড়ে দেশকে শিক্ষার স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দেওয়া গেছে বলে কংগ্রেসি দাবি যে কত বড় ভাঁওতাবাজি তা ধরা পড়েছে বিগত দশ বছরে মৌলিক শিক্ষার ৬.৬ গুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করায়। ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে এ বিষয়ে বরাদ্দ ৮,০০৫ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২,৭০১ কোটি টাকা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অন্তবর্তী বাজেটে এধরনের বরাদ্দ বৃদ্ধির তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু সরকারের মনোভাবের একটা প্রতিফলন এখানে দেখা যায়। গত দশ বছরে কোনও বিষয়ের বরাদ্দ সাতশো গুণ বাড়লে বিষয়টি অস্বাভাবিক তো বটেই, একইসঙ্গে এ বিষয়ে সরকারের অবহেলার দিকটিও ফুটে ওঠে।

ডোনিজারের হিন্দুত্ব-বিরোধী বই প্রত্যাহার ভারতীয় বাজার থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শেষপর্যন্ত হিন্দু সমাজের প্রবল চাপের মুখে মার্কিন লেখক ওয়েনডি ডোনিজারের বিতর্কিত 'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি' বইটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। বইটিতে হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একপ্রকার অপমান করা হয়েছিল। এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন করছিল। বইটির প্রকাশক পেঙ্গুইনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'ভারত থেকে বইটির সমস্ত কপি প্রত্যাহার ও ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।' তবে যত সহজে পুরো প্রক্রিয়াটা হয়েছে বলে ভাবা হচ্ছে তেমনটা নয়। গত দু'বছর ধরে এ বিষয়ে পিটিশনার শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি এবং প্রকাশকের মধ্যে দ্বৈরথ চলেছিল ট্রায়াল কোর্টে এবং দোষীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা পর্যন্ত করা হয়েছিল। বেশ কিছু বছর আগে রাজধানী শহরে কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী মানুষ 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি' গঠন করলে তা দিল্লীতে তো বটেই, এমনকী সারা দেশেই শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সমিতি একদিকে যেমন আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল এ ব্যাপারে, তেমনি শিক্ষাজগতেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই সাঁড়াশি চাপের মধ্যে পড়ে 'বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি'র মধ্যে দিয়ে অবশেষে ভারতের বাজার থেকে হিন্দুধর্মকে অপমানকারী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্যকারী বইটি তুলে নিতে একপ্রকার বাধ্যই হলো।

এনিয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে বলা হয়েছে, 'দ্বিতীয় পার্টি (পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া) নিশ্চিত করেছে যে বইটি সম্পূর্ণভাবে ভারত (ভারতীয় শাসনাধীন এলাকা) থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে যত দ্রুত সম্ভব এবং এই সময়সীমা কখনই আগামী ছ' মাসের বেশি হবে না। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরদিন থেকেই এই ছ'মাসের গণনা শুরু করতে হবে।' ২০১১ সালে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতির আহ্বায়ক দীননাথ বত্রা এনিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলে অতিরিক্ত জেলা বিচারক বলবন্তরাই বনশলের কোর্টে বিষয়টি গিয়ে ওঠে। তাঁর হয়ে মামলাটি লড়েন মনিকা আরোরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও পাঁচ অভিযোগ দায়েরকারী যেমন প্রাক্তন আই এফ এস ও পি গুপ্তা, সরভান কুমার যিনি বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশনের সভাপতি পদে রয়েছেন ও অন্যান্যরা। শ্রী বত্রা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০১০-এর ২৯ এপ্রিল দোষীদের বিরুদ্ধে হজ খাস পুলিশ স্টেশনে বইটির বিরুদ্ধে 'ব্যাপক ভুল ব্যাখ্যা এবং মুদ্রণ-প্রমাদ'- এর অভিযোগ দায়ের করা হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ভারতীয় ভূমি থেকে কাশ্মীরকে মুছে দেওয়া। এমনকী ৬০০ থেকে ১৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তানের অস্তিত্বও দেখানো হয়েছে।

ভারত-বিরোধী, হিন্দুত্ব-বিরোধী এধরনের পুস্তক-প্রণয়ন এদেশে নতুন ঘটনা নয়। এবার স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত ভেস্তে যেতে সমস্বরে তাদের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা মাঠে নেমে পড়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সেন্টিমেন্ট বা আবেগ নিয়ে খেলা করার অনুমোদন দেয়— প্রশ্নটা কিন্তু উঠে পড়েছে।

সোস্যাল নেটওয়ার্কে টি এম সি-র নয়া নাম
টোট্যাল মুসলিম কংগ্রেস

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিষিদ্ধ মৌলবাদী ইসলামি সংগঠন সিমি-র প্রতিষ্ঠাতা বা 'আমির-ই- হলকা, মগরেবি বঙ্গাল' আহমেদ হাসান ইমরানকে রাজ্যসভায় তাঁর দলের সাংসদ করে দিল্লী পাঠিয়েছেন। ইমরান সাহেব কলকাতার ইসলামি মৌলবাদী বাংলা দৈনিক 'কলম' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। গত ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সাড়ম্বরে এই 'কলম' দৈনিকের উদ্বোধন করে ঘোষণা করেছিলেন, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে 'কলম' পত্রিকা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পত্রিকা সম্পাদক এবং বর্তমানে তৃণমূল সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান জানিয়েছিলেন, রাজ্যের বাংলাভাষী মুসলমানদের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য হবে ইসলামি 'মিলাত' অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করা। কারণ, এই রাজ্যে উর্দুভাষী মুসলিম সম্প্রদায় যতটা সংগঠিত ততটা বাংলাভাষী মুসলমানরা ইসলামের ফতোয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তাই কলম পত্রিকা ইসলামি 'তাহাজিব' ও 'তামাদ্দুন' অর্থাৎ ইসলামের সংস্কৃতি ও আদর্শ বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে। শুরুতে 'কলম' দৈনিকের মালিক ছিলেন বর্তমানে জেলবন্দি সারদা চিটফান্ডের মালিক সুদীপ্ত সেন। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ জেল হাজতে থাকা সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। এখন কলম পত্রিকার মালিক তৃণমূল কংগ্রেস দল। দলের নির্দেশে কলম পত্রিকা পরিচালনার কাজকর্ম দেখেন ফিরহাদ হাকিম এবং মুকুল রায়। কলম এখন 'জাগো বাংলা'র মতোই তৃণমূল দলের নিজস্ব মুখপত্র।

রাজ্যসভায় নবনির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান এখন দলের সম্পদ।

গূঢ়পুরুষের

কলম

তিনি ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের পূর্বভারতের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। প্রতিবেশী বাংলাদেশের মৌলবাদী দল জামাত এবং খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টিকে (বিএনপি) পূর্ণ আর্থিক সাহায্য দেয় সৌদি আরবের এই ব্যাঙ্ক। ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক এশিয়া মহাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং আধিপত্যের জন্য অকাতরে অর্থ বিনিয়োগ করে। এই ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য একদা বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে ঘোষণা করতে হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করে পৃথক মুসলিম প্রধান রাজ্য গঠন করার পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের পিছনে ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক বর্তমানে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে। একথা আজ অজানা নয় যে বিশ্বত্রাস জেহাদি সংগঠন 'আল কায়দা' চলে এই ব্যাঙ্কের অর্থে। সংবাদপত্রের খবর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত জামাতে ইসলামির নেতাদের বিচারকে ধর্ম-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দিয়েছে বর্তমানে আল কায়দা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরি। তিনি শেখ হাসিনা সরকারকে পাকিস্তান বিরোধী, শরিয়ত বিরোধী বলে জেহাদের ডাক দিয়েছেন। সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশে হিংসার আগুন এবার আরও দ্রুততার সঙ্গেই ছড়াবে।

অনেকেরই মনে আছে যে ১৯৭৭ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মহম্মদ আহমাদুল্লাহ সিদ্দিকির নেতৃত্বে 'সিমি' বা স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। সেই সভায় ইমরান স্বয়ং উপস্থিত

কলকাতা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সদস্যদের পাক সফর নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা প্রেস ক্লাবের ১০ জনের একটি সাংবাদিক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে যান। ক্লাবের পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়েছে এই সফর একান্তই ব্যক্তিগত তবুও এই সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। দাবি করা হয়েছে, পাক হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলক এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে পাক সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সফরকারী সাংবাদিকরা দাবি করেছেন, তাঁরা নাকি নিজেদের খরচে পাক সফরে যান। কথাটা কী বিশ্বাসযোগ্য ক্লাব সদস্যদের ভেবে দেখা উচিত, বর্তমানে ভারত-পাক সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হওয়ায় দুই দেশই ভিসা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছে। সেখানে কলকাতার কিছু সাংবাদিককে পাকিস্তানে ব্যক্তিগত সফরের জন্য অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে ভিসা মঞ্জুর করাটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পাকিস্তানে কলকাতার এই বিশেষ স্নেহধন্য সাংবাদিকরা ক'টি বৈঠক করেছেন, কী বার্তা দিয়েছেন তা জানতে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সদস্যরা জানতে উৎসুক। ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক জানাবেন কি?

ছিলেন। সেই সভায় সিদ্দিকি ঘোষণা করেন, আহমেদ হাসান ইমরান হবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরে জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগ ভারত সরকার সিমি-কে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এমন একজন সাম্প্রদায়িক নেতাকে সাংবাদিক-সম্পাদক পরিচয় দিয়ে রাজ্যসভায় দলের সাংসদ করেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য বিরোধী দলের পাঁচজন বিধায়ককেও কিনতে পিছু হঠেননি। রাজ্যের রাজনীতিতে বিপুল অর্থে এমন কুৎসিত বিধায়ক বেচাকেনা সম্ভবত নজিরবিহীন। ইমরানকে জেতাতে এত টাকা কোন সূত্র থেকে এসেছে বাংলার সাধারণ মানুষ জানতে চায়। কয়েকটি প্রশ্ন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর কাছে তুলছি, পশ্চিমবঙ্গের ৩৬ শতাংশ মুসলমান ভোট পেতেই কি তিনি কট্টর মৌলবাদী ইমরানকে দলের সাংসদ করেছেন? বাম আমলে বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে তাড়াতে কংগ্রেসে ইদ্রিশ আলির সঙ্গে ইমরান পার্কসার্কাস এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িত ছিল। পরে ইমরান কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যুক্ত হয়। একথা কি সত্যি যে ইমরানের সক্রিয় ভূমিকায় তসলিমাকে কলকাতায় ফেরার অনুমতি নেত্রী দিচ্ছেন না?

একথা কি সত্যি যে তৃণমূল সরকার রাজ্যে ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় চলা বেসরকারি ১০ হাজার মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছে? এ কথা কি সত্যি যে রাজারহাট এলাকায় সরকারি খরচে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বিশেষ আবাসন অঞ্চল গড়া হচ্ছে? এ কথা কি সত্যি যে সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দিতে তৃণমূল সরকার ৯০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের আওতায় এনেছে? এমন প্রশ্ন অনেক আছে। বাংলার অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ মানুষ সবই দেখছেন। শুনছেন। কমপিউটারে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন টি-এম-সি দলের নয়া নামকরণ করা হয়েছে, টোট্যাল মুসলিম কংগ্রেস।

সিবিআইকে ভুয়ো সংঘর্ষের অভিযোগ প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ জানালেন ভূতপূর্ব আই বি কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সিবিআই-এর চার্জশিটপ্রাপ্ত বিশেষ মহানির্দেশক রাজিন্দর কুমার (অবসরপ্রাপ্ত) সম্প্রতি এক বোমা ফাটিয়াছেন। এক বিস্ফোরক বিবৃতিতে জানিয়েছেন— তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ইসরাত-সহ যে চার জঙ্গি গুজরাট পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় তারা সকলেই সন্ত্রাসবাদী ছিল। তিনি এই মর্মে তাঁর ওপর আরোপিত চার্জশিট যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা জানিয়ে সিবিআই-কে সরাসরি তাদের ভুয়ো সংঘর্ষের অভিযোগ অবিলম্বে তথ্য প্রমাণ-সহ প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন। একটি অন্যতম সর্বভারতীয় দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য উঠে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে সিবিআই রাজিন্দর কুমার ও তাঁর তিন সহকর্মীর ওপর গুজরাটে ইসরাত ও তার তিন সঙ্গীকে খুনের চক্রান্ত ও খুন করার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। গত সপ্তাহে দাখিল করা অতিরিক্ত চার্জশিটের ভিত্তিতেই এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আইবি-র ইতিহাসে শ্রীকুমারই হলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার এমন একজন অফিসার (জয়েন্ট ডাইরেক্টর) যার বিরুদ্ধে এমন চরম অভিযোগ আনা হলো। সেই অর্থে এটি নজিরবিহীন। এই মর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে তিনি বলেন, "যদি যথার্থই সিবিআই-এর হাতে তথ্য প্রমাণ থাকে যে মৃতরা সন্ত্রাসবাদী ছিল না তবে তারা সেই প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর না নিয়েই সংঘর্ষের ঘটনাটিকে একতরফাভাবে ভুয়ো বলে অভিহিত করছে।"

অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তার অভিমত হলো, আই বি-র কাজকর্ম কোনো অর্থেই অপরাধমূলক ছিল না। এই সূত্রে তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিটটি পড়ে দেখার অনুরোধ জানান তিনি যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণেরই উল্লেখ করা হয়নি।

সিবিআই-এর দাবি অনুযায়ী নিহতদের কাছ থেকে মৃত্যুর পর যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাদের পোশাকের মধ্যে পাওয়া যায় তা সবই আইবি-র তরফে মতলব করে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করতে শ্রীকুমার সাক্ষাৎকারে বলেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে আইবি-র কাছে অস্ত্র ভাণ্ডার মজুত থাকে। এ সমস্ত প্রসঙ্গই তিনি কোর্টে তোলার সঙ্কল্প জানান। সিবিআই-এর এমন অভিযোগে আইবি আধিকারিকরা ভবিষ্যতে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে কি পালন করতে পারবেন? তাঁদের মধ্যে কি কোনো ভয় ভীতির আশঙ্কা কাজ করবে না— জানতে চাওয়ায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ কুমার জানান, তিনি এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁর একটাই বক্তব্য— তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে কোনো অপরাধ প্রবণতা ছিল না।

প্রসঙ্গত গত বছরের জুলাই মাসে দাখিল করা প্রথম চার্জশিটে সিবিআই চারজন আইবি অফিসারকে পর্যালোচনার আওতায় রেখেছিল, তবে নির্দিষ্টভাবে কারুর নাম করে চিহ্নিত করা হয়নি। সিবিআই-এর বয়ান অনুযায়ী মৃত্যুর আগে ইসরাত ও তার সঙ্গীরা গুজরাত পুলিশের অধীনে ছিল। সংঘর্ষ স্থলে নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের চোখ বেঁধে দেওয়া হয় ও ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা সংঘটিত করে আইবি আধিকারিকরা।

ক্ষমতার আঙুর টক, পালালেন কেজরিওয়াল

অরবিন্দ কেজরিওয়াল
আপপ্রধান
৪১নং বাংলো, হনুমান রোড, নয়াদিল্লী

মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মশাই, আপনাকে কেমন যেন চিনতে পারছি না। এতো দিন শুনছিলাম বাকি রাজনীতিদের মতো নন আপনি। সাধারণের কথা মাথায় রাখাই আপনার কাজ এবং নীতি এবং আদর্শ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখন দেখছি আপনিও বেশ পলিটিকাল। বেশ হিসেব কষেই লোকসভা ভোটের প্রিপারেশন নিতে দিল্লী বিধানসভাকে কাৎ করে দিলেন।

তবে চমকদার হিসেবে আপনার জুড়ি মেলা ভার। আপনার পার্টিও একের পর এক চমক দেখিয়ে চলেছে। সেই যখন রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারে অনশন করছেন তখন আপনার মুখে রাজনীতির বিরুদ্ধে কত কথা শুনেছি। আপনি তখন রাজনীতিকে বিষ্ঠা মনে করতেন। পরে অবশ্য সেই বিষ্ঠাকেই প্রসাদ মনে করে দিল্লীর প্রাসাদ দখলের রাস্তায় নামলেন। আন্নার টুপি দখল করে, আন্নার স্ট্যাম্প গায়ে নিয়ে, আন্নার স্লোগানকে মন্ত্র করে নেমে পড়লেন রাজনীতিতে। শুরু হলো চমক। সঙ্গী জুটল না। তবু রাজনীতির পাকা হিসেব-নিকেশ করে ফেললেন। বুঝে গেলেন ক্ষমতাই আসল। আন্নার ডাকে শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল তার ডিভিডেন্ট নিতে নেমে পড়লেন কোমর বেঁধে। হাতে হাতে মিলল ফল। দিল্লীর ভোটে মিলল ক্ষমতা। আর যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে আপনার পথ চলা শুরু সেই কংগ্রেসের সমর্থন নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্শি দখল।

কিন্তু সেই কুর্শিও কাঁটা হয়ে উঠল। কদিনেই বুঝলেন বাবার হোটেলে খেয়ে সব কিছুর বিরোধিতা করা আর সংসার চালানোর মধ্যে যে ফারাক, রাজনীতির ময়দানেও সেই একই হিসেব। বিরোধিতা করা আর সরকার চালানোর মধ্যে আশমান জমিন ফারাক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'চলছে না, চলবে না' করা আর নিয়ম নীতি মেনে সরকার চালানো যে এক জিনিস নয় সেটা বুঝতে আপনার খুব বেশি সময় লাগেনি। তবু মুখরক্ষার জন্য ৪৮টা দিন চালিয়ে নিয়ে পালালেন, হ্যাঁ দিল্লীবাসী মনে করছে আপনি পালালেন।

একটা প্রশ্ন করব রাগ করবেন না প্লিজ। আপনি ক্ষমতায় আসার আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেসব এখন কে রক্ষা করবে একটু বলবেন কি?

আপনার উত্থান যেমন চমক দেখিয়েছিল ঠিক তেমনই চমক দেখাল আপনার জন-দরবার। সেদিনই আপনি বুঝে গিয়েছিলেন, কথা রাখা অত সহজ নয়। সিনেমায় দেখা স্টাইলে জন-দরবার করতে গিয়ে বুঝেছিলেন, বাস্তব কখনও স্ক্রিপ্ট মেনে হয় না। পালাতে হয়েছিল আপনাকে। সেটা প্রথমবার পালানো। আর শেষে পার্মানেন্টলি পাললেন।

না, তার আগেও একবার পালিয়েছেন আপনি। সেই যে বাংলো নিয়েও ভয়ে পালালেন। আপনার গুরু আন্না হাজারেও কটাক্ষ করে বলেন, ক্ষমতায় এসে অনেকেই সরকারি গাড়ি, বাড়ি না নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু, এখন সব ভুলে গেছেন। সমালোচনা শুনে পালাতে হলো আপনাকে। তারপর আবার পালালেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। পালিয়ে বিক্ষোভকারী হয়ে উঠলেন। চার পুলিশ কর্মীর বদলির দাবিতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই কিনা ১৪৪ ধারা ভেঙে পার্লামেন্টের সামনে ধরনায় বসে পড়লেন। হাততালি পাওয়ার জন্য মন্দ নয় কিন্তু সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেওয়ার জঙ্গি হুমকি কোনও সাংবিধানিক শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর শোভা পায় কি?

একটা বিষয়ে আপনাকে ধন্যবাদ। ৪৮ দিনের সরকারে আপনার আপ কিন্তু অনেক মজার খোরাক জুগিয়েছে। একটা বাচ্চা ছেলে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মন্ত্রী রাখি বিড়লার গাড়ির কাচ ভেঙে দিতে তার বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হলো। আবার প্রাকৃতিক গ্যাস ইস্যুতে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির বিরুদ্ধে এফ আই আর। যেকদিন সরকার চালালেন আপনি তার মধ্যে অধিকাংশ দিনই দিল্লীর সরকার বা উন্নয়ন সংক্রান্ত কথা শোনা গেল না আপনার মুখে। গলায় মাফলার জড়িয়ে বেশিরভাগ দিনই কংগ্রেস আর বিজেপি-র নিন্দা করে কাটিয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল যেন লোকসভা ভোটে জেতার জন্যই আপনার দিল্লীর সরকার গঠন। আসলে সেটাই যে সত্যি তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে কেজরিওয়ালবাবু। গায়ের জোরে জনলোকপাল বিল পাশ করানোর চেষ্টার মধ্যেই সেটা স্পষ্ট। সেটা যে সম্ভব হবে না তা আপনার ভালই জানা ছিল। তাই তো আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন বিল পাশ করাতে না পারলে পদত্যাগ করবেন এবং ছকে ছক মিলিয়ে সেটাই করলেন।

সাবাস। সাবাস কেজরিওয়াল সাহেব। কিন্তু জনগণকে বোকা ভাববেন না। সবাই বুঝে গেছে সীমিত শক্তি নিয়ে দিল্লীর সরকার চালানো আবার একই সঙ্গে লোকসভা ভোটের প্রচার সম্ভব ছিল না আপনাদের পক্ষে। তাই দিল্লীর ছোট সরকার থেকে পালিয়ে দিল্লীর বড় সরকার গঠনের লড়াইতে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা চালু করে দিয়েছেন। আপনার হিসেব খান ৫০ আসন দখল করবেন দেশে। কতটা হবে সে হিসেব জানা নেই। তবে আপনার হিসেব পরিষ্কার। কিছু সাংসদ পেয়ে গেলে স্বচ্ছ কেনাবেচায় অংশ নেওয়া যাবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

সুবিধাবাদের রাজনীতি

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি দিল্লী-বিধানসভার যে নির্বাচন হয়ে গেল, পরে কোনো দল বা পক্ষই একক গরিষ্ঠতা পায়নি। ভোটে ফলাফল হয়েছে এই রকম—

দল	আসন সংখ্যা
বিজেপি	৩২
এ.এ.পি.	২৮
কংগ্রেস	৮
অন্যান্য	২

৭০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় কোনও দল বা পক্ষের সরকার গঠনের জন্য দরকার অন্তত ৩৬টা আসন। কিন্তু এক্ষেত্রে কেউই এই ম্যাজিক ফিগার পায়নি। এই কারণে সরকার গঠন করার জন্য উনিশ দিন লেগেছে— অনেক টানাপোড়েনের পর এ.এ.পি. সরকার পড়েছে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে।

সংবিধানের ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তারপর তাঁরই পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের বেছে নেয়। তবে ১৬৪ (২) নং অনুচ্ছেদে আছে— 'The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legistative Assembly to the state'--- অর্থাৎ মন্ত্রিসভা যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে। সুতরাং বিধানসভায় মন্ত্রীসভার গরিষ্ঠরা না থাকলে তাকে অচিরেই বিদায় নিতে হয়। এই কারণেই রাজ্যপাল একক গরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে থাকেন।

> **কংগ্রেস চিরদিনই ক্ষমতায় বসা বা ক্ষমতার আশেপাশে থাকার আগ্রহী। তাই উনিশ দিন ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস-পরিচালিত ইউপিএ সরকার। শেষ পর্যন্ত তাদেরই সমর্থনে দিল্লীতে এ এ পি সরকার গঠন করেছে।**

ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'If a single political party commands an absolute majority..., the Governor is bound to call upon the leaders of the majority party to form the Government।'[১] তার কারণ হলো— মন্ত্রিসভাকে বিধানসভার আস্থাভাজন হতেই হবে। অবশ্য কাউকে এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী করা হলে তিনি কিছুতেই গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন না। কিন্তু যদি কোনো দল বা গোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার দ্বারা একটা সংখ্যালঘু সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারেন। ডঃ সুভাষচন্দ্র কাশ্যপের মতে, 'This, in practice, means that only a person enjoing majority support in the House is to be appointed as the Chief Minister।'[২] এই কারণে ডঃ বি সি কুডিট মন্তব্য করেছেন, 'In case no party froms the majority, this Governor may excercise his discraction।'[৩]

বৃটেনে ১৯১৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনটে দল— শ্রমিকদল, উদারনৈতিক দল ও রক্ষণশীল দল সক্রিয় ছিল, তাদের দলগত অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম। স্যার আইভর জেলিং লিখেছেন, 'It is possible to have one of three types of minority Government and or one of three types of coalition।'[৪]

এক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু বিতর্ক দেখা দিতে পারে। ডঃ এ.সি. মজুমদারের ভাষায়— 'Is is hore that acute controversy may arise।'[৫] এমনকী আদালতকে এই ব্যাপারে রায় দিতে হতে পারে। কিন্তু রাজ্যপালের এই ধরনের নিয়োগ-ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ওই পদের প্রার্থীকে তাঁর সমর্থকদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার কথা বলতে পারেন। এমনকী, তিনি তাঁদের রাজভবনে আসার নির্দেশও দিতে পারেন।[৬] মনে রাখতে হবে— ১৯৬৯ সালে জ্যোতি বসু এই ধরনের তালিকা দিতে চাননি, ফলে রাজ্যপাল এস এস ধাওয়ান তাকে সুযোগ দেননি। তাছাড়া রাজ্যপাল যদি মনে করেন কোনো নেতা বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য না হয়ে একটা সরকার গড়তে পারবেন, তাহলে তিনি তাঁকেও মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতে পারেন। ১৯৬২ সালে বিধান পরিষদ বা উচ্চকক্ষ থেকে মাদ্রাজে চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীকে এবং ১৯৭২ সালে লোকসভা থেকে

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল।[৭]

আরও একটা কথা। এক্ষেত্রে বৃহত্তম দলের নেতাকেই ভাবতে হবে— এমন কোনো কথা নেই। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন, পি বি গজেন্দ্র গড়কর ও এম সি শীতলবাদ জানিয়েছেন যে, যদি রাজ্যপালের মনে হয়— অন্য কেউ একটা স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবেন, তাহলে তিনি তাঁকেও আহ্বান জানাতে পারেন। তাঁর কাজ হলো— গরিষ্ঠদের নিয়ে একটা সরকার গঠন করা।[৮]

বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা রীতি মেনে বলা হয়নি। কোনো রাজ্যপাল বৃহত্তম দলের নেতাকে আহ্বান করেছেন, কেউ বৃহত্তম দলের নেতার দাবি অগ্রাহ্য করে কোয়ালিশন গড়েছেন, আবার কেউ কেন্দ্রের পছন্দসই কোনও বহিরাগত ব্যক্তিকে ডেকে গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য সুযোগ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'In such situation, the Governor has unlimited discretion in the matter of the appointment of the Chief Minister।'[৯]

তবে দিল্লীর ক্ষেত্রে উপরাজ্যপাল নাজীম জঙ্ বৃহত্তম দল বিজেপি-র নেতা ডঃ হর্ষবর্ধনকেই প্রথমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ডঃ হর্ষবর্ধন কিন্তু এক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও সুস্থ ভূমিকা নিয়েছেন— তিনি জানিয়েছেন— তাঁর দরকার ছিল বাড়তি চারজন বিধায়কের সমর্থন, কিন্তু তিনি দল ভাঙাভাঙির খেলায় যাবেন না। তারপর উপ-রাজ্যপাল এ.এ.পি.-র নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আহ্বান করেন। তিনিও কিন্তু প্রথমে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন— কারণ তাঁর দল ঘোষণা করেছিল, কারও সমর্থন নেওয়া হবে না এবং কাউকে সাহায্যও দেওয়া হবে না। আর ৮ জন বিধায়ককে নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

এই অবস্থায় কিন্তু সংবিধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করাই সঙ্গত ব্যাপার। কিন্তু কংগ্রেস চিরদিনই ক্ষমতায় বসা বা ক্ষমতার আশেপাশে থাকার আগ্রহী। তাই উনিশ দিন ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস-পরিচালিত ইউপিএ সরকার। শেষ পর্যন্ত তাদেরই সমর্থনে দিল্লীতে এ এ পি সরকার গঠন করেছে।"[১০]

এটা পুরোপুরি একটা অনৈতিক ও সুবিধাবাদী ব্যাপার, কারণ এএপি মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার ও লড়াই করে তাকে হারিয়েছিল। সেই কারণেই তার পক্ষে কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করাটা একটা রাজনৈতিক প্রতারণা।

এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের সাংবিধানিক ত্রুটির জন্য। নিয়ম থাকা উচিত ছিল— বিভিন্ন দল ভোটের আগেই জানাবে কার বা কাদের সঙ্গে প্রয়োজনে জোট বাঁধবে বা সমর্থন করবে। আরও দরকার ছিল একটা নিয়ম— যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তারা ভোটের পরে কোয়ালিশন করতে পারবে না বা একে অন্যকে সমর্থন দিয়ে সরকার গড়ার কাজে অংশ নেবে না। কিন্তু সেই ধরনের বিধান নেই। তাই এই রকম সংবিধান আমাদের রাজনীতিতে অব্যাহত আছে। এ.এ.পি. তার স্বপ্নে সততা ও স্বচ্ছতার প্রতীক সেজেছিল— কিন্তু ফাঁকিটা ধরা পড়ে গেছে।

পাদটীকা :

১. ইন্ডিয়ান ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৭০।

২. আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২১৫।

৩. ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২২০।

৪. দ্য কুইন'স্ গভর্নমেন্ট, পৃ. ৫২।

৫. দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৫২।

৬. ডি. এন. পান্ডে। কনস্টিটিউশান পৃ. ২৪০।

৭. ডঃ এম. ভি. পাইলী। অ্যান্ড ইনট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান, পৃ. ২০৩।

৮. ডঃ ভি. ভি. মহাজন। দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৮২।

৯. এস. এন. সিক্রি। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স পৃ. ২৩০।

১০. এম. ভি. পাইলী— কন্‌স্টিটিউশান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৪৯।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657– emil : roy4258@yahoo.com

web : www.calcuttawaterproofing.com

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতবাসীর ভাষা

রমাপ্রসাদ দত্ত

১১৫ বছর পর বরোদার একটি এনজিও ভারতের ভাষাভিত্তিক সমীক্ষা করেছে। প্রত্যেকটি ভাষার একটি তালিকা তারা তৈরি করেছে। খুব কম সংখ্যক লোক কথা বলে সেই ভাষাকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ভাষার সংখ্যা ৭৮০। সমীক্ষাটি করতে সময় লেগেছে চার বছর। ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার স্বেচ্ছাসেবী এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে ৩৫ হাজার পৃষ্ঠায়।

ভারতে এখন কত ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে তা আদমসুমারির শেষতম প্রতিবেদন থেকে জানা যাবে। কিন্তু কতরকম ভাষা চলছে জনসমাজে সে হিসেব পাওয়া একটু কঠিন হলেও তারও সমীক্ষা হয়েছে। ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা এক্ষেত্রে একটা মস্তবড় কাজ করেছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে আমাদের দেশে ৭৮০টি ভাষায় মানুষ কথা বলে। ভাবপ্রকাশ করে। সব ভাষার লিখিত রূপ না থাকলেও সাধারণ দেশবাসী নিজেদের সুবিধেমতো ভাষায় কথা বলে প্রয়োজন মেটায়। দেশজুড়ে ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে চার বছর সময় লেগেছে। ৮৫টি প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবী এই পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিল। ৩৫ হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। এধরনের সমীক্ষার কাজ হলো ১১৫ বছর বাদে।

ভাষা সমীক্ষার কাজ আমাদের দেশে প্রথম করেন এক বিদেশি। জাতিতে আইরিশ। নাম জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। ১৮৯৮ সালে তিনি ভাষা-সমীক্ষার কাজ করেন। তিন বছরের বেশি সময় লেগেছিল তাঁর সমীক্ষার কাজ শেষ করতে। তিনি নথিবদ্ধ করেছিলেন দেশের চলতি ১৭৯টি ভাষার বিবরণ। তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন বহুরকম উপভাষাও কথ্যভাষা রয়েছে। ওইসব ভাষায় প্রচলন ছিল স্বাধীনতার আগেও। তারপর একশো বছরের বেশি সময় বাদে ২০০৫-০৬ সালে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভাষা সমীক্ষার উদ্যোগ নেয়। নাম দেওয়া হয়েছিল : ভারত ভাষা-বিকাশ যোজনা। কিন্তু পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় বিশেষ কারণে। ২০০৭ সালে সরকার আবার সমীক্ষা শুরুর পরিকল্পনা নেয়। নাম দেওয়া হয় : নিউ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই প্রকল্পটি রূপ নেয়নি।

কে নেবে এই কঠিন দায়িত্ব? ২০০৯ সালে একটি বেসরকারি সংগঠন উদ্যোগ নেয়। নাম— ভাষা গবেষণা ও প্রকাশন কেন্দ্র। বরোদরায় এই সংস্থার কেন্দ্র। বলা যেতে পারে এটা বিশ্বের বৃহত্তম ভাষা সমীক্ষা, ওইরকম ব্যাপকভাবে ভাষা শিক্ষার কাজ আর কোনো দেশে এর আগে কখনও হয়নি। ৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা তাদের কাজ। সমাজতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তিন হাজারের উপর স্বেচ্ছাসেবী। এর নাম দেওয়া হয় 'পিপলস্ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। দেশের মধ্যে ৭৮০টি কথ্যভাষা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে মুখের ভাষা প্রাণের ভাষা হিসেবে। এই সমীক্ষার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ২০০১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন। সেখানে সরকার ঘোষিত তথ্য, অনুযায়ী ১২২টি ভাষা রয়েছে। অবশ্য সরকারি লোকগণনার সময় ঠিক হয়েছিল যে ভাষায় কমবেশি দশ হাজার মানুষ কথা বলে তাই-ই স্বীকৃত হবে ভাষা হিসেবে। তবে জানা যাচ্ছে, ৪০০ ভাষা বলে থাকে ভবঘুরে ও জনজাতি সম্প্রদায়। প্রায় ৪০ কোটি মানুষ হিন্দি বলে। আবার সিকিমের এক অঞ্চলে রয়েছে মাত্র চারজন মানুষ, যারা একটি ভাষায় কথা বলে। ৩৫ হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন ৬৮ খণ্ডে সাজানো হয়েছে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় গত ৫ সেপ্টেম্বর। ওই দিনটি দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন এবং শিক্ষক দিবস।

'যেসব ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ৯৬ শতাংশের স্বীকৃতি মেলেনি' —একথা জানিয়েছেন গবেষক ও আন্দোলক গণেশ দাভে। এই প্রকল্পের অন্যতম রূপকার। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দায়িত্ব ছিল কোনো মৃত ভাষার অনুসন্ধান করা অতীতের সমাধি খুঁড়ে। আমরা গৌরবের সঙ্গে বলতে চেয়েছি কত প্রাণবন্ত সচল ভাষা এদেশে রয়েছে। এই ভাষা জীবন্ত এবং গানে, গাথায়, শব্দে তা রূপ নেয়। আমরা মানুষের সেই প্রাণের ভাষার অনুসন্ধান করে তা ধরতে চেয়েছি।' মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দেশের অস্বীকৃত ভাষার সমীক্ষার জন্যে যে কমিটি গড়েছেন তার প্রধান। ভারত ভাষা বিকাশ যোজনার কর্মধারা দেখে সরকারি তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দাভে বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাকরি ছেড়ে ১৯৯৬ সালে বরোদরার জনজাতি গ্রাম তেজগড়ে ভাষা গবেষণা কেন্দ্রের কাজ শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, অস্বীকৃত ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশ আর জনজাতি এবং যাযাবর সম্প্রদায়ের উন্নয়ন।

ভাষা সমীক্ষকদের বলা হয়েছিল, কোনো ভাষার খোঁজ পাবার পর তার বিবর্তনের ইতিহাস যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করা। কীভাবে সেই ভাষা স্থানীয় লোক জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা তুলে ধরা। সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, লোকাচার, সম্পর্ক, চলতি ভাষা থেকে জানার চেষ্টা হয়েছে ভাষা কীরকম সচল। তাঁরা বলতে চেয়েছেন এই কাজকে জনসমীক্ষা। যার সঙ্গে সরকারি সমীক্ষার বাঁধা গতের কোনো মিল নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই সমীক্ষার কাজে যুক্ত হয়েছেন। এই প্রকল্পে সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া হয়নি। খরচ হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা। চারবছর লেগেছে সমীক্ষার কাজে। একে রূপ দেওয়ার জন্যে লেগেছে এক দশকের বেশি সময়। কারণ দেশে এত বড় মাপে ভাষা-সমীক্ষা এর আগে হয়নি।

সমীক্ষকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে অনুসন্ধানী-সমীক্ষা চলেছে ওইভাবে। সমীক্ষকদের বিশেষ তালিম দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ভারতের সবচেয়ে বেশি ভাষা রয়েছে অরুণাচলে। ৯০টি কথ্য ভাষা। পাঞ্জাব হরিয়ানাতে সাতটা করে ভাষা বলা হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও অসমে রয়েছে ৫০টি কথ্য ভাষা।

কিছু ভাষা কখনও স্বীকৃতি পায়নি। যেমন গরপা ভাষা। এই ভাষায় কথা বলে দাদরা ও নগর হাভেলির অধিবাসীরা। সে ভাষার সঙ্গে সমষ্টির বর্ণময় রূপ রয়েছে। মৎস্যজীবীরা সমুদ্রোপকূলে মাছ ধরে চাষবাস করে, ওই ভাষায় কথা বলে গান গায়। গরপা ভাষা বলেন এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ পরিবারের ছোটোরা গুজরাটি বলে। অনেকেই জানে নিজের ভাষা গরপা সম্বন্ধে। বয়স্ক মানুষরা গুজরাটি একেবারেই জানে না। তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য জানা গেছে।

বলরাম পাণ্ডে কাজ করেছেন সিকিমে। সেখানকার ১৫টি ভাষার মধ্যে তিনটির পরিচয় নিয়েছেন। ফুজেল, মাঝহি, থানি তিন ভাষায় কথা হয়নি। খুব কম মানুষ জানেন। মাঝাহি ভাষা বলার লোকজন কম তাঁরা লোকঐতিহ্য রক্ষা করছেন। নতুন প্রজন্ম হিন্দি ইংরেজি নেপালি বলে। সমীক্ষকরা প্রায় অঞ্চল তিনটি ভাষার কথাও লিখিত রূপ ধরেছেন। অসমের ডঃ বিভা ভারালি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমিয়া ভাষা পড়ান। তিনি অসমের ভাষার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ৫৫টি ভাষার পরিচয় ধরা হয়েছে।

কাশ্মীরের মোটামুটি ৩০০ জন বুরুসাসকি ভাষা বলে। ১২৫ বছর ধরে ওই ভাষায় কথা বলা হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা হচ্ছে সযত্নে। মহারাষ্ট্রের ৬০টি ভাষার মধ্যে অনেকগুলিই প্রায় লোপ পাওয়ার দিকে। মেহালি বলে মোটামুটি ১৩০ জন। নোলিং ভাষা একটা গ্রামে সীমাবদ্ধ। অনেক ভাষা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কদর হারিয়ে ফেলছে। মূল ভাষার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, অনেক গোষ্ঠী ভাষাকে হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু বজায় রেখেছে সংস্কৃতি। নৃত্য, গানে, লোক উৎসবে। তারা নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ঠিকঠাক বজায় রেখেছে। ভাষাকে হারিয়ে ফেলেছে অব্যবহারে। কেউ কেউ তাদের ভাষা সম্পর্কে কিছু ভাবে না। অনেক জনজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে নানারকম প্রতিকূলতায়। তারা নিজেদের ভাষার কথা কিছু বলতে পারেনি। পরিস্থিতি কি তাদের মূক করে দিচ্ছে? গুজরাটের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ৫৩টি ভাষা ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। নতুনভাবে সেই ভাষায় রক্তসঞ্চালন অসম্ভব। আবার গুজরাটের কাছে সমুদ্র উপকূলের মানুষ তাদের কোঙ্কিন ভাষাকে প্রাণবন্ত রেখেছে। ৩০ হাজার মানুষ ওই ভাষায় কথা বলে।

সমীক্ষকরা দেখেছেন, অনেক অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ভাষায় কথা বলতে চায় না। সেটা তাদের পরিচিতি। সেই পরিচিতি গোপন রাখতে চায়। তাদের অভিজ্ঞতা আছে পূর্বপুরুষদের কাছে শুনে, ইংরেজ শাসকরা তাদের উপর অত্যাচার করেছে, অপরাধপ্রবণ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে কথা বললে তাদের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে, এজন্য সব গোপন রাখতে চায়। এখনও তাঁদের ধারণা পুলিশ এসে অত্যাচার করবে তাদের পরিচয় জানলে।

অনেকে নিজের ভাষা ছেড়ে জনচলতি বহুজনের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে জনস্রোতে মিশে যায়। তাদের নিজেদের ভাষার ঐতিহ্য কোণঠাসা হয়ে যায়। সমাজ কি তাদের ভাষার শক্তি ও তাদের মর্যাদাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারবে? গুজরাটি সাহিত্যিক কানাজি প্যাটেল বলেছেন, 'জনগোষ্ঠীর বিকাশ সম্ভব যদি তাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়।' ✸

তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

বড় ভাষাগুলি ছোট ভাষার গলা চেপে ধরবে

তারক সাহা॥ একসময়ে শক্তিশালী জাতি বলে গণ্য হোত সেইসব জাতি যাদের একটি মাত্র ভাষা থাকত। অনেকে ভাবত ভারতবর্ষ কী এক রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে পারবে যেখানে এতগুলো ভাষার মানুষ বসবাস করে এবং প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সমান সাংবিধানিক মর্যাদা রয়েছে? শেষমেশ এক সমঝোতায় পৌঁছনো গেল এবং এক সুসংহত যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৃটিশ শাসিত ভারতকে ভাষাভিত্তিক রাজ্যে বিভক্ত করার প্রয়াস চালানো হলো স্বাধীন ভারতবর্ষে। অর্ধশতক বাদে ভাষাকে ভিত্তি করে ১৯৫৬ সালে গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশকে পুনরায় বিভক্ত করার দাবি উঠল রাজ্য গঠনের সেই তেলুগু ভাষা-ভাষীদের নিয়েই। স্পষ্টত একটি ভাষা যে সমন্বয়ের সূত্র হিসেবে কাজ করবে এমনটা নয়।

তাহলে ভারতের ভাষার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনায় কাজ কী? তাহলে ভাষার এই বিভিন্নতা আমাদের কাছে কি বোঝা না উৎসাহের কেন্দ্র? তুলনামূলক ভাবে চীন, ব্রাজিল, স্পেন ও রাশিয়ার মতো দেশ যাদের আর্থিক স্থিতি ভারতের সঙ্গে তুলনীয় তাদের চেয়ে আমাদের দেশে অনেক বেশি জীবন্ত ও প্রচলিত ভাষা রয়েছে। 'পিপলস লিঙ্গুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' বা পি এল এস আই-এর চেয়ারম্যান গণেশ ডেভির মতে, "আমাদের দেশে ভাষা সম্পদ, ভাষা বোঝা নয়; কারণ তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ভাষা বহুল ব্যবহৃত এবং বহু ভাষার দেশে ভাষা অর্থনীতিতে সুপবন বার্তা এনে দেয়।" ২০১০ সালে এই বিপুল দেশে সংস্থাটি তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সমীক্ষা চালায়।

ডেভির ভবিষ্যদ্বাণী যে, এই শতকের শেষে হিন্দী-ভাষীদের সংখ্যা বিশ্বের ইংরেজি ভাষা-ভাষীদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যেতে পারে— এই বিষয়টা বুক চাপড়ে, টেবিল চাপড়ে হয়ত বলা যাবে।

এই সমীক্ষা কিন্তু বিশ্বে এই দ্বিতীয়বার হলো। প্রথমবার হয়েছিল ১৮৯৮ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত জর্জ গ্রিয়ারসনের নেতৃত্বে আর সেটা হয়েছিল উপ-জাতীয় ভাষাগুলির ওপরে। ডেভির মতে এক জাতি'র তত্ত্ব উপ-জাতীয় ভাষাগুলিকে বহু কথিত ভাষাগুলির সঙ্গে সমন্বিত করে। "উপ-জাতীয় ভাষাগুলি উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যখন আরও ছোট খণ্ডিত সমাজে গিয়ে মেশে, তখন অস্বস্তিতে পড়ে যায় বড় ভাষা ও জাতীয় ভাষার প্রভাবে" —এমনটাই ডেভির বক্তব্য।

বিশ্বায়নের যুগে এর প্রভাব থেকে মুক্তির বা এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। সম্প্রতি ইউনেস্কো'র রিপোর্ট আগাম বার্তা শুনিয়ে বলেছে যে, এই শতকের শেষে অর্ধেক ভাষার অবলুপ্তি হবে। ছোট- খাটো ভাষা ও সংস্কৃতির অবলোপনের পর সবকিছু বিশ্বায়নের স্রোতে মিশে যাবে। এইভাবে ছোট জনগোষ্ঠীর ভাষার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং যুবক-যুবতীরা তাদের ভাষাই কেবল হারাবে না, বরং বিশ্বায়নের মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। "আমাদের সংবিধান স্বীকৃত ভাষায় গণতান্ত্রিক অধিকার বিলীন হয়ে যাবে বিশ্বায়নের ঠেলায়" —এই বার্তা পিএলএস আইয়ের আরেক কর্তা কে রঙ্গনের।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ অন্বিতা আব্বি-র মতে ছোট ছোট ভাষার মানুষজন যেভাবে হীনমন্যতায় ভুগছে তাতে তাদের ভাষা সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসবে না। বরং কেউ কেউ ভাবছে যদি তারা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে তবে তারা এক ঘরে হয়ে যাবে। তারা সকলেই চায় যে তাদের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি শিখুক।

ভাষার অপমৃত্যু বহুত্ববাদের তত্ত্বে ইতি টানবে এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও ব্যাঘাত ঘটবে। "বৃহত্তর অঙ্গনে ভাষার অবলুপ্তিকে ঠেকাতে প্রয়োজন ভাষার সংরক্ষণ। ভাষার বহুত্ব জাতির উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়, উল্টে জাতির উন্নতিতে ভাষার সার্বিক উন্নয়ন জরুরি"— অভিমত রঙ্গনের। ✸

নেত্রদান মহাদান

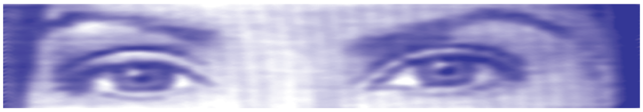

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

জামায়াত বিএনপির পাশে মমতা ?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ হঠাৎ খালেদা জিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত হয়ে গেছেন। বিষয়টি বাংলাদেশের মানুষকে ভাবাচ্ছে এবং অশনি সংকেত বলে মনে করছেন বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষ করে যাঁরা ধর্মান্ধ ঘাতক জামায়েত ইসলামির বিরুদ্ধে লড়ছেন। বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের লক্ষ্য একটি তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে তা দিচ্ছে আমেরিকা, যেমনটি এই ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আফগানিস্তানে সোভিয়েতকে রুখতে আল কায়েদা তৈরি করেছিল। ভারতের এপাশে আরেকটি আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে আমেরিকার পরিকল্পনা এখন আর গোপন নেই। একপাশে পাকিস্তান-আফগানিস্তান, অন্যপাশে তালেবান বাংলাদেশ— ভারতকে চাপে রাখার মোক্ষম অস্ত্র। আর এই পরিকল্পনায় আমেরিকার পাশে রয়েছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম ও অন্যান্য কট্টর ইসলামি দলগুলো। ইদানীং বিএনপি ও জামায়াতের মুখপত্র ও সমর্থক সংবাদমাধ্যমগুলো এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে, এই পরিকল্পনায় ভারতের একমাত্র সমর্থনযোগ্য দল ও নেত্রী হিসেবে মমতা পাশে আছেন।

যে বিএনপি ও জামায়াত-হেফাজতের অত্যাচার, নির্যাতন ও হামলার শিকার হয়ে দলে দলে হিন্দু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ঢুকছে, প্রতিদিনই কোনো না কোনো জেলায় হিন্দুদের ওপর তাণ্ডব চলছে, সেই ধর্মান্ধরা এখন মমতা বলতে গদগদ কেন? সত্যটা প্রকাশ পেয়েছে গত কয়েক মাসে, তাদের সংবাদমাধ্যমেই। বাংলাদেশে জামায়াত নিষিদ্ধ করার আন্দোলন চলছে, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী জামায়াত-বিএনপি নেতাদের বিচার চলছে। এর মধ্যে জামায়াতের সহকারি মহাসচিব কাদের মোল্লার বিচারের পর ফাঁসি হয়েছে, আরও কয়েকজন নেতার মামলার রায়ের পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির শুনানি চলছে। মিরপুরের কসাই বলে কুখ্যাত কাদের মোল্লার ফাঁসি ও জামায়াতের আরেক

সাইদির মুক্তির দাবিতে কলকাতায় জামায়াতের মিছিল। (ফাইল চিত্র)

নেতা বরিশাল-পিরোজপুর অঞ্চলে একাত্তরে হিন্দু নিধনের প্রধান হোতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির ফাঁসির রায়ের পর বাংলাদেশে চলে দফায় দফায় সাম্প্রদায়িক হামলা, আর পশ্চিমবঙ্গে জামায়াতে ইসলামি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তারা শেখ হাসিনাকে পশ্চিমবঙ্গে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবাদে সামিল হয়ে জামায়াতের পাশে দাঁড়িয়েছেন— এমনটাই খবর বেরিয়েছে বিএনপি-জামায়াত নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনপুষ্ট সংবাদমাধ্যমে। বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম ফুঁসে উঠেছে ধর্মান্ধ জামায়াত ও তাদের সহযোগী বিএনপির বিরুদ্ধে। আর প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে সেই জামায়াতকে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশে জামায়াত- বিএনপির অত্যাচার নির্যাতনে হিন্দুদের ঘরবাড়ি হারিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় খুঁজে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে এখন এমন একটা বিশ্বাস ভিত্তি পাচ্ছে, হিন্দু নির্মূলে মমতার সায় আছে।

আরও কারণ আছে। বাংলাদেশে বর্তমান আওয়ামি লিগ পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক দল এমন বলা না গেলেও এটা ঠিক যে শিবরাত্রির সলতের মতো অসাম্প্রদায়িক ধারায় এটাই প্রধান শক্তি। মন্দের ভালো। সেই দল একাত্তরের ঘাতকদের বিচার করে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে চাইছে, বিএনপির সাম্প্রদায়িক ভূমিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং এই দুদলেরই ভারতের এপাশে কট্টর একটি তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র রুখে দিচ্ছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার রায়ে প্রকাশ পেয়েছে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র সরবরাহে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সহায়তা করেছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, তাঁর দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং জামায়াতে ইসলামির নেতারা জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের এই

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে বর্ণনা করেছিলেন। বিএনপি ও জামায়াত ইসলামির এই ভূমিকা সমর্থন করছেন মমতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার কড়া হাতে বন্ধ করে ভারতের নিরাপত্তা ঝুঁকি যে শেখ হাসিনা কমিয়ে দিয়ে উগ্রপন্থীদের রোষের শিকার হয়েছেন মমতা তাঁরও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন— এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের কাগজে আরও একটি খবর বেরিয়েছে--- পশ্চিমবঙ্গে জামায়াত ইসলামির একটি দৈনিক কাগজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মমতা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। জামায়াত ইসলামির এক নেতাকে রাজ্যসভার সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামির বিভিন্ন প্রকাশনা ঘেঁটে দেখা যায়, তাদের মূল উদ্দেশ্য শুধু বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করে ভারতকে চাপে রাখা নয়, ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করাও। আর সেই জামায়াতের পাশে মমতা। অথচ বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামিকে শুধু নিষিদ্ধ নয়, তাদের সকল প্রকাশনা, ব্যাঙ্ক-সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও বন্ধের দাবিতে আন্দোলন চলছে। শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ থেকে জামায়াতের সকল প্রতিষ্ঠান বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছে। টাঙানো হয় জামায়াতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা।

ইদানীং বিএনপি ও জামায়াতের আর একটি প্রতারণা লক্ষণীয়। দুদলের সমর্থক সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে মমতা তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি সই ও সীমান্ত সমস্যার সমাধানে সম্মত হবেন না। বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলেই সংকটের সুরাহা হবে। একটি দৈনিকে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি মমতার সঙ্গে একটি যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে জামায়াত ইসলামি মমতার সহায়তায় শেখ হাসিনা বিরোধী একটি বড় গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জামায়াত ইসলামি ও বিএনপি যোগাযোগ রক্ষা করছে। পশ্চিমবঙ্গে জামায়াত ইসলামি শক্তির দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও তাদের আর্থিক বুনিয়াদ অনেক শক্ত। বাংলাদেশে

বিএনপি মমতার সঙ্গে একটি যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে জামায়াত ইসলামি মমতার সহায়তায় শেখ হাসিনা বিরোধী একটি বড় গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জামায়াত ইসলামি ও বিএনপি যোগাযোগ রক্ষা করছে।

শেখ হাসিনাকে উৎখাত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করতে গোটা ভারতের জামায়াত ইসলামি পশ্চিমবঙ্গ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামির কাছে অর্থ পাঠায়। যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ হচ্ছে নির্বিচারে হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা, গণহত্যা, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ, হিন্দু হত্যার ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা এবং হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরের জায়গা দখল। এসব মামলায় হিন্দুরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন ট্রাইব্যুনালে। যার কারণে প্রত্যেকটি মামলার রায়ের পর হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট ও মন্দির হামলা ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে। জামায়াতের অন্যতম শীর্ষ নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদির বিচারের রায় ঘোষণার পর তাঁর নিজ জেলা পিরোজপুরে এক হিন্দু মহিলা বলেছিলেন, তিনি স্বামী হত্যার বিচার পেয়েছেন। ওই রাতেই তার ওপর জামায়াত কর্মীরা হামলা করে, বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। নির্দয়ভাবে মারধোর করে মহিলাকে।

একাত্তরের সেই গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা তো রয়েছেই, সাম্প্রতিক সময়ের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছি। এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামলে প্রায় ১১ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। গত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সিখেছেন, বিএনপি- জামায়াত ক্ষমতায় এলে এক কোটি হিন্দুকে এবার দেশত্যাগ করতে হতো। জামায়াতের আরেক ডানা হেফাজতে ইসলাম বলেছে, এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। অন্য ধর্মের চর্চা এই মাটিতে হবে না। পুতুল পূজা হবে না। যারা হিসেব মেলাতে পারেন না তাদের জানার জন্যই বলতে হচ্ছে, এই উপমহাদেশে জামায়াত কিন্তু একটাই। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে এক জামায়াতই কাজ করছে। আল কায়েদার তত্ত্ব ও জামায়াতের তত্ত্বের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

আমেদাবাদের মেট্রোপলিটন আদালতে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুলবর্গা সোসাইটির হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে নরেন্দ্র মোদীকে নির্দোষ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গুজরাট দাঙ্গার প্রায় ১১ বছর পর মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন মোদী। প্রমাণ হলো, কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিলে তা ধোপে টেকে না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় ইউপিএ-র কান্ডারি কংগ্রেস দল গুজরাট সরকারকে দায়ী করে সারা দেশে অপপ্রচার চালিয়েছিল। নানা কুৎসা রটিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে ভ্রষ্টাচারীরা নিশ্চয়ই উচিত শিক্ষা পেয়েছেন। অবশ্য নানা কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত তথাকথিত নেতা-নেত্রীরা যে সত্যের পথপ্রদর্শকদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেবেন এটাই স্বাভাবিক। নেহরুর রাজত্বে জিপ্ কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে বোফর্স, টেলিকম্, আইপিএল- সহ নানা কেলেঙ্কারির ঘটনায় দেশের সার্বভৌমত্ব লজ্জিত হয়েছে বারংবার। আর এই দুর্নীতির নেপথ্যে রয়েছে নেহরু-গান্ধী পরিবার তথা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার। কারণ জওহরলাল নেহরুর সূচনা করা প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেছেন কন্যা ইন্দিরা, ইন্দিরাপুত্র রাজীব। বর্তমানে মনমোহন সিং বকলমে রাজীবপত্নী সোনিয়া গান্ধী। আবার আগামীদিনে সোনিয়াপুত্র রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে চান কংগ্রেস নেত্রী। অবশ্য এটা বাস্তবায়িত হওয়া যে দিবাস্বপ্ন তা সম্প্রতি চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রাজতন্ত্র দিয়ে ধ্বংস করতে সচেষ্ট গান্ধী নেহরু পরিবার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিবারতন্ত্র কায়েম করাই যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে। আর দেশের দুর্বলতম প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছেন। আর দেশের সফলতম মুখ্যমন্ত্রী তথা ভাবী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটাতে ব্যস্ত ইউপিএ সরকার। কিন্তু কোনো কুৎসাই নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যকে টলাতে পারেনি। যে-কোনো অপপ্রচারকে ধরাশায়ী করেছে আমজনতা। তাই মোদীর যে-কোনো জনসভায় ব্যাপক জনসমাগম হয়ে থাকে। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্ব ও সাফল্যের উদাহরণ গুজরাট মডেল সারা দেশের কাছে আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। আর কংগ্রেস দল তথা ইউপিএ সরকার নানা কেলেঙ্কারি, অপশাসনে ক্রমশই জর্জরিত হয়ে পড়ছে। তথাকথিত দুর্নীতিগ্রস্ত এই নেতা-নেত্রীদের মোদীর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাই বড়ই বেমানান। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র উত্থানে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর নীতিনিষ্ঠ, উন্নয়নের রোলমডেল সেই নরেন্দ্র মোদীকে দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে পাবেন তা আশা করা নিশ্চয় অমূলক নয়।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয়স্বার্থ

স্বামীজী বলেছেন, 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না', অথচ স্বাধীন ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু চালাকি চলছে। এই রাজনৈতিক চালাকি দ্বারাই দেশের প্রান্তে প্রান্তে এক একটা রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে এবং উঠে চলেছে। এই দলগুলি শুধু জাতীয় সংহতির বদলে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় গোষ্ঠী, এমনকী ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে মূলধন করে জনগণকে বোকা বানিয়ে নিজেরা ক্ষমতা ভোগ করার তাল ভাঁজছে। জনগণ ভেবে দেখে না, কাগজওয়ালা ও টিভি চ্যানেলওয়ালাও বলে না যে এদের কোনো সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এরা জনগণকে সামাজিকতার সুশিক্ষা দেয় না। ঠিক এমনি ভাবেই সস্তায় বা বিনামূল্যে কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে রাজধানী দিল্লীর মতো জায়গার ভোটারদের মন জয় করে ভুঁইফোড় যে দলটি উঠে এল তার নাম হলো আম-আদমি পার্টি। এরা তো অনেক কিছু পাইয়ে দেওয়ার কথা বলল কিন্তু জনগণের নিরাপত্তা পাইয়ে দেওয়ার কথা কিছু বললো না তো! আর এরা ভোটের লোভে মুসলিম মৌলবাদীদেরও পা ধরল। বলিহারি দেশের রাজধানী দিল্লীর ভোটারদের বিচারবুদ্ধি! তারা এমন একটি দলকে ভোট দিল যার মন-ভোলানো কথাবার্তা ছাড়া কোনো অতীত সুকৃতীর ইতিহাস নেই। এদের কথা ও কাজেরও কোনো মিল নেই। কংগ্রেসকে এত গালাগাল দিয়ে, কারও সমর্থন নেব না এই কথা বলে আবার সেই কংগ্রেসেরই সমর্থন নিয়ে গদিতে বসল। আবার বলছে যে আমরা পুনরায় জনমত নিয়ে, মিটিং করে, মোবাইলে এস এম এস এবং ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে জনমত যাচাই করে সরকার গঠন করেছি। এসব কেমন কথাবার্তা? আমাদের দেশ কি প্রাচীন গ্রীসের মতো ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভক্ত, যেখানে একটা মাঠে নগরের সব লোককে জড় করে সকলকার মতামত নেওয়া হোত? ওদের পার্টি কি দিল্লীর সব লোকের মতামত নিয়েছে? আর এসব ভাঁওতাবাজিতে জনগণ ভুলছেন কেন?

ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল হলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত সেরকমই একটি দুর্ভাগা দেশ। জনগণের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই আঞ্চলিক দলগুলি গড়ে উঠছে এবং নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যা ইউরোপ-আমেরিকার মতো মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির নেই, তাই তারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছে। ওই দেশগুলি আমাদের দেশের মতো শত্রুপরিবেষ্টিত তো নয়ই, আবার ওদের এত গণ্ডা গণ্ডা রাজনৈতিক দলও নেই। ভারত এমন একটা বিচিত্র দেশ যেখানে বিদেশী মতবাদের দালালরাও রাজনৈতিক দল গড়ে

ভোটে লড়তে পারে এবং দেশের অন্নে লালিত-পালিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে দেশের লোকেরাই দেশের লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে। দেশের সীমানা কেন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কেন শত্রুরাষ্ট্রের সেপাইরা আমাদের সীমানায় ঢুকে ঘাঁটি গাড়ছে, কেন আমাদের সৈনিকদের মাথা কেটে নিয়ে সীমানা পার হয়ে চলে যাচ্ছে। কেন সীমানা দিয়ে জালটাকা দেশের ভেতর ঢুকছে, কেন হিন্দুরা মার খেয়ে সীমানা টপকে আমাদের এখানে এসে আশ্রয়ভিক্ষা চাইছে— এ নিয়ে না আছে এই ভুঁইফোড় দলগুলির চিন্তা, না আছে এ দেশের ভোটারদের কোনো চিন্তা। পৃথিবীর মধ্যে এটা এমনই একটা দুর্ভাগা দেশ।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

সবাই হিন্দু

সারা ভারত
এক পরিবার
সব ভারতীয়
সদস্য তার।
সব জলের
উৎস সিন্ধু
ভিন্ন পথ—
সবাই হিন্দু।

—সুশীল কুমার সরকার,
উত্তর ব্রহ্মপুর, নদীয়া।

নারীশক্তি

সভ্যতার মুখ পুড়ছে, অসভ্যতার অগ্নিদাহে।
নারীরা আজ কাঁদছে পথে, দু' চোখে তার অশ্রু বহে।।
নারীলোভী শিয়াল কুকুর ঘুরছে এই সভ্য দেশে।
সুযোগ বুঝে পাথর মারো, কিম্বা মারো পায়ে পিষে।।

এক চরম অরাজকতার মধ্য দিয়ে আমরা এবং আমাদের রাজ্য তথা দেশ চলছে। অরাজকতা ছেয়ে ফেলেছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে। মানুষ যেন আজ মান আর হুঁশ হারিয়ে রক্ত-মাংসহীন নরকঙ্কাল।

ভারত মা এবং বাংলা মা দুই মা যেন আজ অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বলে চলেছেন— স্বর্ণে মোড়া জন্মভূমিকে আজ তোরা বর্ণহীন, মরচে পড়া এক লৌহখণ্ডে রূপান্তরিত করলি!

নারী কারো মা, কারো বোন, কারো জীবনসঙ্গিনী। যুগ যুগ ধরে এই হচ্ছে আমাদের কাছে তাদের পরিচয়। তার চোখের জল আমাদের লজ্জা। কিন্তু আমরা কী ব্যবহার করে চলেছি তাদের সঙ্গে?

সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ছে— নারী ধর্ষণ, খুন, পুড়িয়ে মারা, পণ দিতে না পারার জন্য তার উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার ইত্যাদি সব ঘটনা।

কিন্তু আমরা এইটুকু বুঝতে পারি না বা বোঝার চেষ্টা করি না নারীকে পদদলিত করে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি আর পারবেও না। কারণ, নারী দুর্গা, নারী অন্নপূর্ণা, নারী শক্তি। পুরুষের সকল শক্তির উৎস, ঠিক বিশ্বভুবন আলোকিত করা সূর্যের মতো। তাই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। দিল্লী, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, কাটোয়া, পার্কস্ট্রিট এবং অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত নরপিশাচ হায়েনার দল নির্ভয়া, দামিনী, অজয়াদের এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে দেয়নি, তাদের নারীত্বকে পদদলিত করেছে, সেই সমস্ত নরপিশাচদের চাই কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি।

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী, বর্ধমান।

দূরদর্শনের একটি দৃশ্য

দূরদর্শনে ডিডি বাংলা চ্যানেলে আবহাওয়ার খবর পড়ার সময় একটি দৃশ্য দেখানো হয়— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর ছবির সম্মুখে একজন ইউরোপিয়ান ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিক থেকে একটি জুড়িগাড়ি চলমান অবস্থায়। আবহাওয়ার খবরের সঙ্গে এই দৃশ্যের কি সম্পর্ক? এদৃশ্য না দেখালেই নয়? দৃশ্যটি দেখে বৃটিশ শাসনের কথা মনে পড়ে। স্বাধীন ভারতে বৃটিশের অনুকরণ বা তাদের স্মরণ করা কি খুবই প্রয়োজন? আবহাওয়ার সঙ্গে ওই দৃশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু দেখানো হচ্ছে।তাই, এ ধরনের দৃশ্য দেখানো অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

মনীষীর মা

অরবিন্দ-জননী স্বর্ণলতা দেবী

রূপশ্রী দত্ত

শ্রীঅরবিন্দের জননীর নাম ছিল স্বর্ণলতা দেবী (১৮৫২- ১৯০৭)। ইনি তৎকালীন বিশিষ্ট মনীষী রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। উদার ধর্মাচরণ ও মহত্ত্বের জন্য লোকে সশ্রদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে রাজনারায়ণের নামের আগে 'ঋষি' যুক্ত করেছিল। শৈশবে স্বর্ণলতা পিতার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের পরিমণ্ডলেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল। চার ভাই ও পাঁচ বোনের সংসারে স্বর্ণলতা বড় হয়েছিলেন।

১৮৬৪ সালে, ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে হয়। স্বর্ণলতার পিতা রাজনারায়ণ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের পুরোধা এবং কৃষ্ণধনেরও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম অনুসরণ করেই বিয়ে হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবোদিত কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। পাত্র কৃষ্ণধনের তরফে নিতান্ত অল্পসংখ্যক আত্মীয়েরাই যোগদান করেছিলেন। কারণ কৃষ্ণধনের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু। ঋষি রাজনারায়ণ বসু ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগবশতই কৃষ্ণধন এ বিয়ে করেছিলেন।

কৃষ্ণধন ও স্বর্ণলতার পাঁচপুত্র ও এক কন্যার নাম বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ, সরোজিনী ও বারীন্দ্রকুমার। (একপুত্র শৈশবে মৃত)। সরকারি ডিস্‌পেনসারির দায়িত্ব নিয়ে কৃষ্ণধন সস্ত্রীক ভাগলপুর গমন করেন। সেখানে ১৮৬৭ সালে বিনয়ভূষণ ও ১৯ জানুয়ারি ১৮৬৯ সালে মনোমোহনের জন্ম হয়। ১৮৭০ সালে কৃষ্ণধন বৃটেনে যান। স্বর্ণলতা দুই সন্তানকে নিয়ে এদেশে বাস করতে লাগলেন। সঙ্গিনী ছিলেন নার্স প্যাগেট। ১৮৭১ সালে স্বর্ণলতা গেলেন রংপুরে। কৃষ্ণধন সেখানকার সিভিল স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এই সময় স্বর্ণলতার বংশানুক্রমিক এক মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়। মারাত্মক হিস্টিরিয়া এই সময় স্বর্ণলতা ও তার স্বামী কৃষ্ণধনের জীবনকে গভীরভাবে অসুখী করে তোলে। কৃষ্ণধন তাঁর কর্মক্ষেত্রে রোগিণীকে ফেলে যেতে পারেন না। তাঁর কাজের বোঝা ক্রমশ জমে ওঠে। নিজেও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। পারিবারিক বন্ধু হেনরি বেভারিজ ও তাঁর স্ত্রী অ্যানি তাঁদের প্রায়ই নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করতেন। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কৃষ্ণধনের ইচ্ছানুসারে স্বর্ণলতা ইংরেজিতে কথোপকথন শিখেছিলেন ও পাশ্চাত্য নারীসুলভ স্কার্ট পরিধান করতেন। কিন্তু তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীনতা ক্রমশ বেড়ে চলছিল। একদিন তিনি অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে, চীৎকার করে পুত্র মনোমোহনকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করলেন। বালক অরবিন্দ সে অমানবিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ভীত, বেদনার্ত অসহায় হয়ে জলপানের অছিলায় স্থান ত্যাগ করলেন।

১৮৭৮ সালে স্বর্ণলতা ও কৃষ্ণধন তাঁদের তিনপুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। সেখানে কৃষ্ণধনের চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজ চিকিৎসক স্বর্ণলতার স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রনাথের জন্মের পর পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন কৃষ্ণধন তার নাম দেন ইমান্যুয়েল বারীন ঘোষ, যেমন অরবিন্দের নামকরণ হয়েছিল অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড্ ঘোষ।

১৮৮০ সালে, কৃষ্ণধন বুঝেছিলেন, স্বর্ণলতার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। দেওঘরের কাছে একটি সুন্দর বাংলোতে স্বর্ণলতা ও দুই সন্তান— বারীন ও সরোজিনীর থাকার বন্দোবস্ত হলো। পরিণত বয়সে বারীন পিতার স্মৃতিচারণ করেছেন। দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত কৃষ্ণধন নানা খেলনা, বিস্কুট ও মিষ্টি নিয়ে আসতেন, কোলে বসাতেন। তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রুতে বারীনের ছোট দেহ প্রায় ঢেকে যেত। তিনি লোক পাঠিয়ে বারীনকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উন্মাদিনী স্বর্ণলতা ভেতর থেকে ছুরি নিয়ে আসতে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। স্বর্ণলতা অকারণে কখনও তীব্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন, কখনও রাগে খাঁচায় বন্ধ বাঘিনীর ন্যায় গর্জন করতেন। অরবিন্দ পরিণত বয়সে, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে স্বর্ণলতা বলে ওঠেন— "আমার অরবিন্দ কখনওই এত বড় নয়, সে ছোট ছেলে।" যখন তাঁকে বোঝানো হলো কালের ব্যবধানের কথা তখন তিনি অরবিন্দের আঙুলের কাটা দাগ দেখতে চাইলেন। বাল্যকালে অরবিন্দের হাত কেটে গিয়ে যে ক্ষতচিহ্ন হয়েছিল, অরবিন্দ তাড়াতাড়ি তা দেখালেন। উন্মাদিনী জননী তখন ছেলেকে চিনতে পারলেন।

বিখ্যাত পিতার কন্যা, সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামীর ঘরনি, অরবিন্দের মতো এক বিরাট মহাপুরুষের জননী হয়েও গুরুতর মানসিক রোগিণী স্বর্ণলতা চিরদুঃখিনী। এই মহীয়সীর বিষাদময় জীবন আমাদের বেদনার্ত করে তোলে। ✸

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

পর্ব—২১

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগের নূতন ধারা

মন্দির : কর্ণগড়

ড. প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি থানার অন্তর্গত কর্ণগড় ইতিহাস ও পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান।

বহুকাল আগে এই স্থানে সিংহরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। সিংহরাজবংশের শেষ রাজা অজিত সিংহের মহিষী রানি শিরোমণি (রাজ্যকাল ১৭৫৫-১৮১৩ খৃস্টাব্দ) চুয়াড় বিদ্রোহের এক নায়িকারূপে আজও স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

সিংহরাজবংশের প্রতিষ্ঠিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দির দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার দু'টি সুদৃশ্য ওড়িশা-রীতির 'শিখর'-দেউল। এই দু'টি মন্দিরের প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পরিত্যক্ত একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ এই স্থানের দর্শনীয় পুরাকীর্তি। গড়ের তিন দিক বেষ্টন করে আছে শীর্ণকায়া পাবাং নদী। গড়ের একদিক দুর্ভেদ্য জঙ্গলের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর মধ্যে ভিতরগড়ের চারপাশ একসময় গভীর পরিখা বেষ্টিত ছিল। রাজপ্রাসাদ এই ভিতরগড়ে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই প্রাসাদের জঙ্গলাবৃত ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করা যায়। ভিতরগড়ের দু'টি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত মন্দির এখানে উল্লেখ করা যায় : ১. মাক্‌ড়া পাথরে তৈরি বৃহদাকার 'দুর্গাদালান'। এখানে সিংহবাহিনী অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে এঁরই উল্লেখ করেছেন। ২. শ্যামসুন্দরের 'বিষ্ণুপুরী' রীতির 'আটচালা'। এটির ওপরের চারটি চাল একটি পৃথক ও কক্ষযুক্ত না হয়ে ঠিক খোড়ো 'আটচালা'র ওপরের কাটা 'চারচালা'র মতো।

ভিতরগড়ের বাইরে পারাং-এর দক্ষিণ তীরে পূর্বমুখী একটি পরিত্যক্ত 'একরত্ন' আছে।

এই গড় থেকে দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার পূর্বোক্ত দু'টি মন্দির ওড়িশী 'শিখর' দেউলের উজ্জ্বল নিদর্শন। দু'টি মন্দিরই চওড়া উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। পশ্চিমমুখী প্রবেশদ্বারের ওপর ত্রিতল 'যোগমণ্ডল'। দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার দু'টি মন্দিরই পশ্চিমমুখী। পূর্বদিকে নিষ্ক্রমণপথের ওপর ভগ্ন নহবৎখানা।

দণ্ডেশ্বরের 'সপ্তরথ' 'রেখ' দেউল ও সংলগ্ন পিঢ়া 'জগমোহন' মাকড়া পাথরে নির্মিত। দেউল বা 'বিমানে'র গর্ভগৃহ সংকীর্ণ। দণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ 'গৌরীপট্টে'র প্রায় আট ফুট ভিতরে জলের মধ্যে নিমগ্ন, বাইরে 'সিদ্ধিকুণ্ডে'র সঙ্গে এর যোগ আছে বলে জানা যায়।

'জগমোহন' বা পরিদর্শন কক্ষের প্রশস্ত অভ্যন্তরভাগে একদিকে খগেশ্বর শিবলিঙ্গ ও অন্যদিকে (অগ্নিকোণে) কবি রামেশ্বরের আসন। আসনটি একটি অনুচ্চ প্রস্তরবেদি। এই বেদিটির সামনে আর একটি বেদি ও সামনে দেওয়াল সংলগ্ন পুঁথির পাতা রাখার কুলুঙ্গী। কবি রামেশ্বর এখানে বসে কাব্য রচনা করতেন বলে জানা যায়। দণ্ডেশ্বর মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে কয়েকটি মূর্তিভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের প্রশস্ত অধিষ্ঠানবেদিটি 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল' রীতির। মন্দিরটির 'বিমানে'র বাইরের দেওয়ালে কয়েকটি 'স্টাকো' মূর্তি লক্ষণীয়।

দণ্ডেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী মহামায়ার 'পঞ্চরথ' 'শিখর' দেউল ও সংলগ্ন 'জগমোহন'ও পশ্চিমমুখী। মহামায়া মন্দিরের গর্ভগৃহ সংকীর্ণ। এখানে মহামায়া ও অভয়ার মূর্তি বর্তমান এবং পাশ্ববর্তী 'পঞ্চমুণ্ডীর আসন' প্রতিষ্ঠিত। রাজা যশোবন্ত সিংহ ও কবি রামেশ্বর এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সাধনা করতেন বলে জানা যায়।

মন্দির-প্রাচীরের বাইরে উত্তরপূর্ব কোণে রামেশ্বরের সমাধি মন্দির বর্তমান। তার পাশে যশোবন্ত সিংহের সমাধির ধ্বংসাবশেষ আছে। রামেশ্বরের পুরানো সমাধির ওপরে একটি নতুন সমাধি তৈরি হয় ১৩৬৯ সালে (১৯৬২ খৃস্টাব্দে)। সেটিও এখনলুপ্ত।

এই দু'টি মন্দিরের কোথাও কোনো লিপি নেই। তবে আনুমানিক ১৭১১ খৃস্টাব্দে মহামায়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহ ছিলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা। ✸

সংস্কৃত সাহিত্যে চৌষট্টি কলা

রবীন সেনগুপ্ত

কলা বা আর্ট নিয়ে চর্চা সারা বিশ্বেই হয়ে আসছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে। কিন্তু সেইসব দেশগুলিতে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় আর সাহিত্য— এই কয়টিকেই কলা বলে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীতে একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই কলার সংখ্যা ৬৪টি। ঠিক কোন গুলিকে এই চৌষট্টি কলার মধ্যে ফেলা যাবে তা নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কলাবিদ্যাকে যে কতখানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতরা সকলেই যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই।

বর্তমান যুগেও যাঁরা ব্যাপকভাবে সংস্কৃত চর্চা ও প্রচার করে থাকেন তাঁরাও প্রাচীন পণ্ডিতদের এই বিশাল রেঞ্জের আর্ট কালচারকে ধরে রেখেছেন। আজও আমরা নাচ, গান, চিত্র, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, বক্তৃতা, ম্যাজিক, সন্তান পালন, বাগান তৈরি, হাঁটাচলা, কথাবলা, তাকানোর ভঙ্গিমা, শয্যা নির্মাণ এগুলিকেও চৌষট্টি কলার মধ্যে গণ্য করে থাকি।

আগুন নিয়ে খেলা করা, সাপ নিয়ে খেলা দেখানো, জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন, রাজনীতি করা এগুলিও এক প্রকারের কলা। প্রাচীন যুগে মধ্যভারতে ভোজপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ভোজ যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি গ্রন্থও লিখে গিয়েছেন। তাঁর নামানুসারে যাদুবিদ্যাকে আজও অনেকে ভোজবাজি বলে থাকেন।

চান্দেল্ল রাজাদের রাজত্বকালে খাজুরাহে কামকলা বা রতি শিল্পের উপর নানা প্রকার ভাস্কর্য গড়া হয়েছিল। প্রাচীনকালে ঋষি বাৎসায়ন কামসূত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ সার্থক ভাবে প্রেম, ভালবাসা ও দেহমিলন একটা বিশেষ বিজ্ঞান, এগুলিও একপ্রকার আর্টের অঙ্গ। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের মানুষজন দাবি করত যে তারাই একমাত্র কাম-উপভোগের নানা কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে। কিন্তু খাজুরাহতে পুনরায় আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে জনৈক ইংরেজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত স্ট্যাচুগুলি দেখে প্রমাণ হয়ে গেল যে হিন্দুরা ওই গুহ্য বিষয়টির উপরেও অনন্য দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

রূপ সজ্জা বা বিউটিশিয়ান বিষয়ক কার্যকলাপকেও চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দুরা মুখ ও ত্বকের লাবণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রচুর শ্লোক রচনা করে গেছেন। বিশেষ অঙ্গ শিথিল হয়ে গেলে কি করে তার সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় এই জাতীয় বিষয়ও সেই সব শ্লোকে স্থান পেয়েছে। বৃদ্ধ হয়ে গেলে কি করে যুবকদের মতো দেহ মন ধরে রাখা যায় তার উপযোগী নানা খাদ্য, ঔষধ ও যোগক্রিয়ার কথাও হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে রয়েছে। বিদেশীরা এইগুলির উপর নতুন করে গবেষণা করে আধুনিক প্যাকেজের সাহায্যে বাজারে নানা পণ্য বিক্রয় করে থাকে নিয়মিত।

অঙ্গে তেলমালিশ করা, পূজা অর্চনা করা, শাস্ত্র পাঠ ও প্রচার করা, যুদ্ধ করা, সংগঠন করা এগুলিকেও আর্ট হিসাবে গণ্য করে হিন্দুরা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। জলের মধ্যে ক্রীড়া করা, ইঙ্গিতে কথা বলা, গোয়েন্দাগিরি করা এগুলিকেও কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে চৌষট্টি কলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। তারের বাজনা বাজানো, তবলা, খোল, পাখোয়াজ, ড্রাম, যুদ্ধভেরি, বাঁশি, জলতরঙ্গ বাজানোর বিদ্যাগুলিকে সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রকাররাই খুব গুরুত্ব সহকারে আর্টের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। বাঁশি, সেতার, তবলা, খোল, এস্রাজ, সরোদ বাদনে আজও হিন্দুদের সমকক্ষ কেউই নেই সারা বিশ্বে। কোনো কোনো গ্রন্থে মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা— এগুলিকেও আর্ট বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি যেহেতু পাপ কাজ তাই সাধুভাবাপন্ন হিন্দুগণ এগুলিকে অপশিল্প হিসাবেই গণ্য করেছেন। মূকাভিনয়, কৌতুক শিল্প, আলপনা দেওয়া, গৃহসজ্জা, নগর সাজানো— এগুলিকেও হিন্দুরা ভাল শিল্প বলে মর্যাদা দিয়ে আসছেন অনেক যুগ থেকেই। যে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকর্মার নয়টি পুত্র ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লেখা আছে যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁর নয়টি পুত্রকে নয় ধরনের শিল্পবিদ্যা শিখিয়ে যান। এগুলির মধ্যে কাংস্য শিল্প, কর্মকারের কাজ, গৃহ নির্মাণের বিদ্যা, স্বর্ণশিল্পের কাজ ইত্যাদিও ছিল বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে।

সব মিলিয়ে এটা বলা যায় যে আমরা কেউ কেউ যারা বিদ্যাগুলিকে হীন চোখে দেখে থাকি, চৌষট্টি কলার চোখ দিয়ে দেখলে সেগুলি সবই শিল্প হিসাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ✸

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(েন
মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

নবাঙ্কুর

গল্প তৈরির গল্প

মোতিমালা আর পাঁচুর কথা

কৌশিক গুহ

নতুন বছরের কয়েকটা সপ্তাহ বেশ চাপে কাটল। সরস্বতী পুজোর পর ছেলেমেয়েরা অজয়-স্যারকে টিচার্স রুমে একা পেয়ে বলল, 'স্যার, গল্প তৈরির ক্লাস একদিন করবেন?' অজয়-স্যার ছাত্রছাত্রীদের কথা মন দিয়ে শোনেন। প্রত্যেককে স্নেহ করেন। কার কি অসুবিধে হচ্ছে তা জানতে বুঝতে চান। সব কিছুতে দারুণ উৎসাহ। ছেলেমেয়েরা বাড়িতেও বলে অজয়-স্যারের কথা। হসটেলে থাকেন। বইপত্র ভালোবাসেন। বেহালা বাজান। সাইকেলে চড়ে ঘোরেন স্কুল ক্যামপাসের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। তার মধ্যে সব দেখা হয়ে যায়। অন্য শিক্ষকরা বেপরোয়া ভঙ্গিতে টিউশানি করেন। অজয়-স্যার বলেন, 'আমার সময় নেই, ইচ্ছেও নেই।' যেটুকু বাড়তি সময় মিলবে তা লেখাপড়ার কাজে লাগাতে চান। খুব

ভালো গল্প বলতে পারেন। অজয়-স্যার গল্পের ক্লাস নেবেন বলায় ছেলের দল তো খুশিতে মেতে উঠল। স্যার বললেন, 'একই নিয়ম। একজনের পর একজন। ঘণ্টা বাজলে শুরু করবে একজন। তার নাম করা হবে। ঘণ্টা বাজলে সে থামবে। যার নাম বলা হবে সে শুরু করবে। গল্পের শুরুটা আমি বলছি। হাতিটা অনেকদিন কাজ করছে সার্কাসে। সৌরদীপ।'

সৌরদীপ শুরু করল, 'হাতিটার নাম মোতিমালা। দেখাশোনা করে ময়ূরভঞ্জের গিরিধারী মহান্তি। সে হাতিটাকে খুব ভালোবাসে। খুব যত্ন করে। কানে কানে কিসব বলে। সার্কাসের মালিক বাঙালি। শিশির সরকার। গিরিধারীর কাজে খুব খুশি।' ঘণ্টা বাজল। শুরু করল স্বর্ণাভ, 'হাতির খাওয়ার জন্যে পাতাটাতা জোগাড় করতে হয়। ফল চাল ডাল এসবও আছে। মোতিমালার খাবার কোনো সময়ে কম যেন না হয়— এমনই কড়া হুকুম শিশির সরকারের। গিরিধারীর সারাটা দিন কাটে মোতিমালাকে নিয়ে। কেউ কেউ বলে গিরিধারী আসলে হাতিই, মানুষের চেহারায় আছে।' ঘণ্টা বাজল। শুরু করল আর্য।

'রোজ সন্ধেবেলা সার্কাসের খেলায় দুবার আসে মোতিমালা। তাকে সাজিয়ে দেয় গিরিধারী আর বনোয়ারি। দুলকি চালে সার্কাসের খেলার সময় ঢোকে। তাকে দেখে খুব খুশি হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। মোতিমালারও ভালো লাগে তাদের হইচই। গিরিধারী আর বনোয়ারি খেলার জায়গায় ঢোকে না।' ঘণ্টা বাজল। শুরু হলো দেবাঞ্জনের কথা।

'কেরলের গোবিন্দন পিল্লাই খেলা দেখানোর জন্যে পিঠে বসে। লম্বা রোগা। বয়স বোঝা যায় না। দারুণ চটপটে। ওর সঙ্গে থাকে তিনজন জোকার। সারাদিন তারা খুব গম্ভীর। সার্কাসের খেলার সময় সবাইকে মাতিয়ে রাখে নানারকম অঙ্গভঙ্গিতে। রমেশ, দিবাকর, অর্জুন। রমেশ দিবাকর আসলে ট্রেনার। সবরকম খেলা জানে। অর্জুন খুব ছোট চেহারার। খেলা করে না, তবে হাসাতে পারে।' ঘণ্টা বাজল। এবারে সপ্তর্ষি।

মোতিমালা শুঁড় তোলে উপরে তিনবার খেলা শুরুর আগে। দর্শকদের সম্মান জানায়। সনাতন মুখার্জি খেলা দেখায় মোতিমালাকে নিয়ে। তিন জোকার মজা করে। মোতিমালা মাথা নাড়ে তাদের ভাবভঙ্গি দেখে। সনাতন একটা টুলে বসতে বলে মোতিমালাকে। অভ্যেস হয়ে গেছে। তারপর একটা বোর্ডে সংখ্যা আটকায় শুঁড় দিয়ে কাঠের টুকরো তুলে তুলে।' ঘণ্টা বাজল। এবার বৌধায়ন।

'শেষ খেলা গজানন যোশীর বুকের ওপর ওঠা। চটপট তক্তা পেতে গদি পেতে দেওয়া হয়। শক্তিমান গজানন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। উপরে একটা মোটা গদি পাতা হয়। দু'পাশে লাগানো হয় খাঁজ কাটা তক্তা। মোতিমালা ওঠে। সামান্য সময় থেকে নেমে যায়। গজানন উঠে সকলের দিকে হাত নাড়ে। মোতিমালা শুঁড় তুলে অভিবাদন জানায়। খেলা শেষ।' ঘণ্টা বাজল। শুরু করে অঙ্কিতা।

'সেদিন রাতে সার্কাসের তাঁবু যখন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তখন পাঁচু নামে বাঁদরটা বলল, চলো মোতিমালা সার্কাস ছেড়ে পালাই। রোজ একরকম কাজ ভালো লাগে না আর। মোতিমালা রাজি। দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে চারিদিক। ওরা বেরিয়ে চলতে শুরু করল। চলছে তো মোতিমালা। পাঁচু বসে আছে পিঠে।' ঘণ্টা বাজল। বলা শুরু ঐন্দ্রিলার।

'রাস্তার ধারে এক কলাবাগান দেখে দুজনে পেট ভরে খেলো। মোতিমালা খেলো কলাগাছ কাঁচা কলা। পাঁচু খেলো পাকা কলা। কিছু খাবার মোতির পিঠে বাঁধার ব্যবস্থা করল পাঁচু। ওরা পৌঁছোল রাস্তা ধরে স্টেশনে। ঠিক করেছে ট্রেনে করে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে। সার্কাসে আর ফিরবে না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবে।' ঘণ্টা বাজল। কৃষ্ণসুহানা শুরু করল।

'স্টেশন মাস্টারকে টিকিট চাইল। তিনি দেখিয়ে দিলেন পাশে রাখা একটা ওয়াগন। পাঁচু উঠে বসল। মোতিমালা উঠবে কি করে? স্টেশন মাস্টার বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে বললেন কাল সকালে ক্রেন আনিয়ে তুলে দেবো।' ঘণ্টা বাজল। শুরু করল লিপিকা।

'ভোর হওয়ার আগেই হইচই। মোতিমালার তখন একটু ঘুম ধরেছিল। সার্কাসের লোকজন ছুটে এসেছে দল বেঁধে। গিরিধারী বনোয়ারী ও আরো অনেকে। খুঁজতে খুঁজতে এসে গেছে। মোতিমালা বলল, যাওয়া হলো না রে পাঁচু।' ঘণ্টা বাজল। শুরু করল রঞ্জিতা।

'গিরিধারী তার শুঁড় জড়িয়ে বলল কাঁদতে কাঁদতে, 'আমি কি করেছি মা! না বলে পালিয়ে যাচ্ছিলি।' বনোয়ারী খাবার দিল। ফিরে চলল দুজনে আবার সার্কাসে।' গল্প শেষ।

অজয়-স্যার বললেন, 'চমৎকার হয়েছে।' মজা পেয়েছে সবাই।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

ভালো বই সবসময় বন্ধু

পুবালি একটু বড়ো পুষ্পলের থেকে। যমজ ভাইবোন। দিদি আর ভাই। ভাইকে খুব ভালোবাসে পুবালি। পুষ্পলও মনে করে দিদি তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। কম কথা বলে দুজনে। খেলা পড়াশোনা আঁকাজোকা একসঙ্গে। ওরা নাচ গান আবৃত্তি শিখেছে। স্কুলের পড়াও মন দিয়ে করে। সবসময় হাসি-হাসি মুখ। কয়েকবছর আগে ওরা পড়তে পারত না। সকলেই ওইরকম থাকে প্রথমে। তারপর পড়তে শেখে। নিজে নিজে পড়লে পড়ার মজাটা দারুণ। নতুন বইয়ের গন্ধও ভালো লাগে ওদের। আঠা কাগজ কালিতে অন্যরকম মনে হয়। ওদের দুজনেরই সংগ্রহে অনেক না হলেও বেশ কিছু বই রয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। যত্নে রেখে দেয়। একেকটা বই হাতে নিলেই অন্যরকম লাগে। বইকে বন্ধু করে নিতে পেরেছে পুষ্পল। আগে ভাবত বইপড়া মানে কঠিন শাস্তি। এখন দারুণ মজা পায়। ছবি দিয়ে গল্প বলা হয়েছে যেসব বইয়ে

সেগুলো পড়তে গিয়ে দেখেছে কত মজা ছড়ানো। কত নতুন নতুন শব্দ শিখে নিয়েছে। জন্মদিনে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে বড়োদের কাছ থেকে বই পেলে খুব খুশি হয় ওরা। ওরা বড়োদের দেয় নিজেদের হাতে আঁকা ছবি। বড়োরা খুউব আদর করে বলে : 'ভালো থেকো। বড়ো হও।' জন্মদিনে পাওয়া কার্ডগুলো ওদের মা খুব যত্নে রেখে দিয়েছে। বইগুলোর সঙ্গে তাদের ভালোবাসা জড়িয়ে আছে।

ভালো বই সকলের কাছে সবসময় সেরা পছন্দের মধ্যে থাকে। পুষ্পল তার শোনা নানান গল্প থেকে এমন একটা করে গল্প বেছে নেয় যা পরে নতুন লাগে। ছবি আঁকে। বড়োদের দেখালে বলে, 'এসবই জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে। ভালো বই সবসময় সব বয়সীর বন্ধু।' পুবালি-পুষ্পল প্রত্যেকটা বই অনেক বার পড়েছে। না পড়ে জমানোর অভ্যেস ওদের নেই।

বইমিত্র

উলটো পালটা

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ট্যাঁড়া পিটছে স্বরূপ নস্কর। ট্যাঁড়ার শব্দ ভেসে এলেই লোকজন কান খাড়া করে শোনে। যারা কম শোনে তারা বলে, 'কি বলতে চায় একটু শুনে বল্‌তো।' ছোট ছেলের দল ছুটে যায়। কিছু বোঝে কিছু বোঝে না। না বুঝলেও মজা পায়। চলতি গ্রামজীবনে এও তো একটু অন্যস্বাদ এনে দেয়। সেদিন স্বরূপ নস্কর তিনবার ট্যাঁড়া পিটিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে গলা ছেড়ে বলল, 'নতিবপুর বটতলার সামনে আজ বিকেলে সভা। দলে দলে যোগ দিন।' রাধাশ্যাম ফচকে ছেলে। একটু উল্টোপাল্টা বলে দেয় এর ওর সামনে। সে সরাসরি একটা প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ গো স্বরূপকাকা, সভা তো হবে। কিন্তু সভাপতি হবে কে?' স্বরূপ মুখ ভেংচে বলল, 'এই জন্যে তোকে লোকে ডাকে রাধার বদলে গাধা। আরে ট্যাঁড়া পিটছি আমি, সভাপতি হবে বুঝি ভিন্ গাঁয়ের লোক? আরে শোন, সবাইকে বল গিয়ে আমিই হবো সভাপতি। বিকেলে যাস। আমার বক্তৃতার পর হাততালি দিবি। ঘুগনি পাঁওরুটি খাওয়াবো।'

২.

দশরথ সিং-এর ভাগলপুরে বাড়ি। হাওড়ায় এসেছিল গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে। সেই প্রথম ট্রেনে চড়া। দেশের লোকরা স্টেশনে নেমে যায়। দশরথ ঘুমোচ্ছিল। তাকে কেউ

ডাকেনি। তার সঙ্গে একটা পুঁটলি আর তাতে খাবার দাবার কিছু। গরম লাগছিল বলে জামাটাও পুঁটলিতে বাঁধা। কলকাতায় আসার জন্যে মা তিনশো টাকা দিয়েছিল পাশের গাঁয়ের সহদেব মিশ্রকে। কলকাতায় মজুরের কাজ আছে। হাওড়ায় নেমে তাকে না নিয়ে সহদেব আর অন্য সঙ্গীরা বেরিয়ে যায়। ট্রেন যখন ফাঁকা হয়েছে রেল কোম্পানির একজন বলল, 'তুমি কোথায় যাবে? লোকজন কোথায়?' সে বাংলা বোঝে না। শুধু বলল, 'দশরথ ভাগলপুর।' রেলের লোক বলল, 'দশরথ, রাম যেই-ই হও এখন নেমে যাও।' সহদেব বেরোবে কি করে! তার কাছে তো টিকিটই নেই। গেটের ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল, ভালো পোষাক পরা লোকজন বুকে হাত ঠেকিয়ে 'মান্থলি' বলে চলে যাচ্ছে। গেটে দাঁড়ানো কালোকোট পরা লোকটা ছেড়ে দিচ্ছে। দশরথ খানিকক্ষণ দেখার পর ওইভাবে বুকে হাত দিয়ে মানথলি বলে অন্য বিপদে পড়ল। তার খালি গা। বুকে পকেট নেই, মান্থলি থাকবে কি করে! চেকার হেসে ধরে ফেলল তাকে। তারপরে কীভাবে রেহাই মিলেছিল সে অন্য বৃত্তান্ত।

রামগরুড় সংকলিত

মঙ্গলজয়ী বাঙালি কন্যা অনিতা

অঙ্কিতা নস্কর

প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীপুরুষের সীমারেখা কোনোদিনই ছিল না। নারী-পুরুষের মিলিত শক্তিই তখন দেশ ও দশের সঙ্কটমোচনে এগিয়ে আসতো। তাই তখন গার্গী-মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী-র মতো বক্ষবাদিনী নারীরা জ্ঞানদানে দেশ-জাতিকে যেমন পুষ্ট করেছেন, তেমনি পরবর্তীতে রানি দুর্গাবতী, রানি লক্ষ্মীবাই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানকালেও "থাকবো নাকো বদ্ধঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে"— সত্য করে কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়ামের মতো এক বাঙালি কন্যাও মঙ্গলজয় করে ফেলেছেন। অবশ্য তিনি সশরীরে মঙ্গলে পা রাখেননি; তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র 'ডিসকভারি' সফলভাবে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে খুঁটিনাটি তথ্য এনে দিয়েছে নাসার বিজ্ঞানীদের হাতে। এতে যেমন মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণার একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল, তেমনি প্রমাণিত হলো বাঙালি মেয়েরাও কোনো অংশে কম নয়।

সেই বিস্ময় বাঙালি মেয়ে অনিতা সেনগুপ্ত। বাঙালি হলেও তাঁর জন্ম-কর্ম কিন্তু আমেরিকাতেই। আমেরিকার নাসায় ডিসকভারির প্রধান প্রযুক্তিবিদ এবং মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গবেষণার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত অনিতা মাত্র ২৮ বছর বয়সেই অনেক কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীর খুব কাছের গ্রহ মঙ্গলের প্রকৃত রহস্যের উন্মোচন করলেন। ১৯৯৪-৯৮ সালে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরোস্পেস ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতক হন ১৯৯৮-২০০০ সালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরোস্পেস ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০১-২০০৪ সালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রী পান। বর্তমানে তিনি শুধুমাত্র নাসাতে নয়, জেট প্রেপালশন গবেষণাক্ষেত্রের প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে কর্মরতা। এছাড়া ২০১০-২০১২ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের মুখ্য প্রযুক্তিবিদ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই বঙ্গ তনয়ার সাফল্যের ঝুড়িতে অনেক সম্মান আছে। বিশেষ সম্মান যেগুলি পেয়েছেন তার মধ্যে ১৯৯৮ সালে বস্টন এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশিপ, ২০০১ সালে বোয়িং স্পেস এবং প্রযুক্তিক্ষেত্রে কমিউনিকেশন অ্যাচিভমেন্ট সম্মান, ২০০৫ সালে জেপিএল টিম সম্মান এবং ২০০৬ সালে মহিলা প্রযুক্তিবিদ হিসাবে বর্ষসেরা সম্মান। এছাড়া ২০০৯ সালে জেপিএল স্পট সম্মান এবং মেরিন সম্মান তিনি পেয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে এতো বড় সাফল্য এই প্রথম কোনো বাঙালি মেয়ে পেলেন। তাঁর এই সাফল্য শুধু ভারতীয়দের মুখ উজ্জ্বল করেনি, সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক অসাধ্য সাধন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে জীবনের কোনো উচ্চ লক্ষ্য পূরণ করতে হলে প্রথমে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হয়, তাহলেই সেই লক্ষ্যে একদিন পৌঁছানো সম্ভব। এরকম একটি স্বপ্ন খুব ছোটবেলা থেকে দেখতেন অনিতা সেনগুপ্ত। তাই আজ এতো বড়ো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে মঙ্গল গ্রহকে নিয়ে নানা কৌতূহল, নানা প্রশ্ন তার মনের মধ্যে জাগে। অনিতার বাবা পদার্থ বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী থাকার সুবাদে বাবার আদর্শে মেয়েও পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করে। সবাই যখন পদার্থবিদ্যার অঙ্ক করতে হিমসিম খেয়ে যায় তখন অনিতার অঙ্কের পাতা জুড়ে হিসাব চলছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব কত এবং মঙ্গলের মাটিতে কি কি আছে, তা নিয়ে সে হিসেব-নিকেশে মত্ত। স্কুলে পড়ার সময় থেকে অনিতার লক্ষ্য শুধু স্কুলের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা নয়, লক্ষ্য ছিল মঙ্গল গ্রহ নিয়ে। অনিতা ছোট থেকে পড়াশুনার পাশাপাশি স্বামীজীর বই পড়তেন এবং স্বামীজীর আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছেন। তাই তিনি বিদেশের মাটিতে পড়াশুনা করলেও ভারতে আসার জন্য সর্বদা তাঁর মন ব্যাকুল থাকতো। বর্তমানে অনিতা নাসার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। দীর্ঘ সাত বছর মঙ্গল গ্রহকে নিয়ে গবেষণা করার পর ২০০৮-২০০৯ সালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের আবিষ্কারের কথা মুখ ফুটে বলেই ফেললেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন নিজে যেতে না পারলেও যন্ত্র পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহকে নিয়ে যাবতীয় কৌতূহলের প্রশ্ন দূর করা সম্ভব। নাসার নিয়ম অনুসারে পোডিয়ামে যখন অনিতা তাঁর আবিষ্কারের তথ্য ডেমোনেস্ট্রেশনের মধ্যে তুলে ধরেন তখন সমস্ত বিজ্ঞানী নাসার সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুমে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর যখন বিবরণ দেওয়া শেষ হলো করতালিতে সবাই অনিতাকে সম্মান জানান। অনিতার অভিমত— ঠিক তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তিনি আনন্দে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন এবং তখনও তিনি জানেন না, সারা বিশ্ব ক্যামেরা নিয়ে তাঁর ছবি তুলছে। শুধুমাত্র স্বামীজীর আদর্শকে পাথেয় করে এতো বড় সাফল্য লাভের অনুপ্রেরণা পান তিনি। ভারতীয় মেয়েরা যে বড় বড় সাফল্যের পথপ্রদর্শক তা বাঙালি মেয়ে অনিতা আমাদের সকলকে মনে করিয়ে দিল। এটা ভবিষ্যতে মেয়েদের সাফল্য লাভের পাথেয় হয়ে থাকবে। ✸

অতিথি কলম

এম জে আকবর

একছুটে প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে ভেসে যেতে হবে

সাহিত্য জগতে অমর প্রেমের যে বিরহ গাথা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তা তর্কহীনভাবেই শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট'। অনেকেই এটিকে নিয়তির চূড়ান্ত পরিহাস বলেই মনে করেন। তা কিন্তু নয়। আদতে অল্পে ধৈর্য হারিয়ে নিজেকে বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়ারই এক করুণ উদাহরণ। বিশ্বখ্যাত নাটকটি যাদের পড়া আছে তারা জানেন মহাকবি এই নাটকে প্রমাণ করেছেন যে পুরুষ স্বভাববশতই এক বোকা প্রজাতির জীব। না খোঁজ নিয়ে, না জেনে দুম করে রোমিও আত্মহত্যা করে বসল, কেননা জুলিয়েট নাকি মারা গেছে। হায়! প্রেমের তুমুল টানাপোড়েনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত জুলিয়েট একটু ঘুমের আশায় সামান্য ঘুম পাড়ানো বড়ি খেয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কাজ ছিল একান্তই সময়োপযোগী। বিয়োগান্ত চমকের চূড়ান্ত পরিণতি দেখাতে শেষমেশ নাট্যকার জুলিয়েটকে অনেকটা জোর করেই তার কবরে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

অথচ রোমিও হঠকারিতায় নিজের প্রাণ বিসর্জন না দিলে নাটক তো জমত না। সেক্ষেত্রে গড়পড়তা পাঁচজনের মতো রোমিও ভেরোনা শহরে বৃদ্ধ এক দাদু হয়ে পার্কে বসে থাকত আর ঠাকুমা জুলিয়েট তার নাতি-নাতনিদের সোয়েটার বুনত। নাটক কোথায়? নাটকের উপসংহার চরম নায়কের ধৈর্যহীনতার ফলশ্রুতিতে পাঠক-দর্শকের চোখের জলে ভাসা।

রাজনীতির মধ্যেও বেশ মিশে আছে থিয়েটার। সব রাজনীতিকই সেটা ভালই জানেন। তবে প্রেম শব্দটা অবশ্য সে অর্থে রাজনৈতিক নয়। সেই কারণে এখানে পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির ভিত্তিতেই সম্পর্ক তৈরি হয়। এই কথাটা কংগ্রেস আর আম আদমি পার্টির আপস ঢলাঢলি দেখলেই নজরে পড়বে। এখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। সবটাই একে অপরকে ব্যবহার করার বন্দোবস্ত। কেজরিওয়ালের মতো নতুন টগবগে নেতাকে দিয়ে মোদীর বিধ্বংসী অভিযান ঠেকাতে কংগ্রেস এক শেষ চেষ্টা করেছে। কংগ্রেস পরবর্তী লোকসভা গঠনের স্বপ্ন আর দেখে না। এই দলের প্রবীণ মুখপাত্র ও মন্ত্রী চিদাম্বরম সুদূর ডাভোসে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবারের লোকসভা ত্রিশঙ্কু হবে। মজার কথা, তার জায়গায় বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে কংগ্রেসের কোনো দুঃখ নেই। তার যাবতীয় অন্তর্দাহ মোদীর প্রধানমন্ত্রী বনে যাওয়ার সম্ভাবনায়। এই মর্মযন্ত্রণা থেকে উঠে এসেছে কেজরিওয়ালকে ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা। কেজরিওয়াল হয়তো বিজেপি-র আসন সংখ্যায় ভাগ বসাতে পারে। এমন এক আন্দাজ।

আবার রাতারাতি পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মুখ্যমন্ত্রী বনে গিয়ে দুঃসাহসী কেজরিওয়াল ভাবছেন তিনি হয়তো কংগ্রেসকে ব্যবহার করে তার (কংগ্রেসের) সীমিত পছন্দের সুযোগে এক লাফে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন। নিশ্চয়, এই শতাব্দীর মাফলার জড়ানো মহাত্মা সেজে থাকার সুবাদে এ তো তার ন্যায্য দাবি। হ্যাঁ, উচ্চাশা লালন করা তো কোনো অন্যায় নয়। এটি তো গণতন্ত্রের দেশে স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু উচ্চাশা পূরণ করতে গেলে লাগে দু'টো জিনিস। উচ্চাশার লালন পালন আর লেগে থাকা। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন যে এলো বলে আমাদের কেজরিওয়ালবাবুর তাই মহাতাড়া। প্রেমে পড়া একজন টিনএজার সদাই অধৈর্য থাকে। কিন্তু তুমি যদি মাঝবয়সের শেষ দিকে থাক আর তোমার ক্ষেত্র যদি হয় রাজনীতি তাহলে দু'টো আর এক থাকে না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দিল্লীবাসী হওয়া ও দিল্লীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হওয়ার সুবাদে তিনি দিল্লীর বিখ্যাত রাজনৈতিক রোগ ইগো এলিফ্যানটিয়াটিসে' (হাতির মতো মদগর্বী) আক্রান্ত। মাথার ভেতরে এমন পোকা কিলবিল করে যে নিজের থেকে ক্ষমতার অলিন্দে সামনের লোকটা কতদূরে তা সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে ভীষণ বাধার সৃষ্টি হয়। কেজরিওয়াল ভাবছিলেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কুরসি এক ছুটে মেরে দেওয়া যায়। তার ওপর দু'টোই তো এক শহরের মধ্যে। না ভাই, এ দৌড় ম্যারাথন। তোমাকে অনেক হিসেব করে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কেজরিওয়াল কি জানেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আসল লড়াই হয় গোরখপুরে, নাসিকে, চাপরায়, কাসারগেড়ে বা ঝুমরিতালাইয়ায়। কেবল খিড়কি এক্সটেনশনের মতো দিল্লীর কেন্দ্রস্থলে নয়। দিল্লীর প্রান্ত সীমা পেরিয়ে এলেই শব্দের অনেক মানেই পাল্টে যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে শুধুমাত্র ৭০০ লিটার জল দিলেই স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেছে বলে তারা ভাবে না। তাও আবার এর এক বিন্দু বেশি নিলে মোটা টাকা জরিমানা। অন্ধ্রের মানুষ আজ ভাবছে তেলেঙ্গানা তৈরি হলে কৃষ্ণা, গোদাবরীর জল 'সীমান্ধ্রে' পৌঁছবে তো? দেশের হাজার হাজার গ্রামবাসী এখনও উজ্জ্বল একটি বৈদ্যুতিক বাতির আশায় চোখ মেলে আছে। তাদের কাছে দিল্লীর অর্থবান বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের সরকারি খরচার বিপুল ভরতুকি দিয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ দেওয়ায় কিছু আসে যায় না।

আমার বেশ মনে হয়, প্রবাদবাক্যের একটা ভাল বই কেজরিওয়ালকে দিলে বড় ভাল হয়। যেমন তিনি ঝালিয়ে নিতে পারবেন— (১) কাপড় অনুযায়ী কোট কাট, (২) ঝাঁপ মারার আগে তাকাও— এমন আরও অনেক। এই সব সহজ জ্ঞানগুলি বহু শতাব্দীর মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার ছাঁকনিতে পরিশোধিত। দেখুন, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মানুষের কাছে কেজরিওয়াল ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত

দেবদূত। মিডিয়ার কাছেও প্রায় তাই। মাসের শেষ সপ্তাহে এসেই এই দেবদূত হয়ে গেলেন ‘পাগল’।

অবশ্য দু’টি অভিধার কোনোটিই সত্যি নয়। তিনি কখনই দেবদূত ছিলেন না, তাই এখনও পাগল নন। প্রথম অবতারে তিনি ছিলেন অন্যকে দোষী বানাতে কর্কশ। এখন তিনি ধর্মাবতার সাজতে উদ্‌গ্রীব। প্রথমদিনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা করায়ত্ত করা। এখন তাঁর লক্ষ্য আরও, আরও ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা। কিন্তু শুধুমাত্র দোষারোপের রাজনীতি করে উঠে আসলে সেই একই পাল্টা বিরোধিতার চাপে তুমি নিজেও ভেসে যেতে পার— কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আবার কেজরিওয়াল যে বারবার নিজেকে নৈরাজ্যবাদী বলে জাহির করছেন সেটিও আচরণগতভাবে সঠিক নয়। বিরাট একটা জন-কোলাহলের মধ্যে নেতা হিসেবে নিজেকে জাহির করে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি দিয়ে হাততালি কুড়োনোর নাটক তিনি অবশ্য ভালই উপভোগ করেন। নৈরাজ্যবাদী চলতি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়, কেজরিওয়াল আরও পাঁচটা ক্ষমতালিপ্সুর মতো চলতি ব্যবস্থাটিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে চান। বাস্তবে যা কিছু বা যে কেউ তাঁর মতের বা কাজের বিরোধিতা করবেন সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর বিরোধী হয়ে পড়বেন। অবশ্য এই ধরনের প্রতিহিংসার রাস্তা তাৎক্ষণিক কিছুটা জনপ্রিয় একনায়করা বরাবরই খুব পছন্দ করেন। হাতে গরম উদাহরণ দেখুন— দেশের অন্যতম বৃহৎ এক সংবাদ মাধ্যম যেইমাত্র তাঁর অমার্জনীয় আইনমন্ত্রীর স্বপক্ষে ধরনা দেওয়ার যৌক্তিকতার প্রশ্নটি তুললেন দলের পক্ষ থেকে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলো।

ধৈর্যের যে মূল প্রশ্নটি দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গেই শেষ করব। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের ওপর যখন ১৯৪৭-এর অক্টোবরে জঙ্গি পাকিস্তানি আক্রমণ নেমে এল তখন এক বৃটিশ সাংবাদিক কিছুটা ব্যঙ্গের ছলে গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন আক্রান্ত কাশ্মীরে তিনি তাঁর বিখ্যাত অহিংসার অস্ত্র কেন প্রয়োগ করে দেখছেন না। গান্ধী সেই সাংবাদিকের প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। বস্তুত অহিংসা কখনই বদমাইশির কাছে নতি স্বীকার করতে শেখায় না। রাজ্যকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতেই হবে। অহিংসার পূজারি হয়েও সেদিন কাশ্মীরে যে সৈন্যরা বিদেশী আক্রমণ ঠেকিয়েছিল, নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিল, গান্ধী তাঁদের মহান বীরের সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন। তাই ক্ষমতা অধিকার করার সঙ্গেই সঙ্গেই আসে দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা। যাঁরা সেটা বোঝেন না বা বুঝেও না বোঝার ভান করেন তাঁরা কিছুতেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন না। ভোটদাতারাও তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সংবিধানের আওতায় থেকে রাতারাতি দেশের কাঠামো পাল্টানো যায় না। তার জন্য চাই ধৈর্যের সাধনা। ধৈর্যহীনতার কারণে খাঁটি প্রেমই শুধু নষ্ট হয়নি, নস্যাৎ হয়েছে অনেক সদিচ্ছাও।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
গোয়া	উত্তর গোয়া ও দক্ষিন গোয়া	৮	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪	৭,৫০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ- লক্ষ্মনঝোলা - দেরাদুন- মুসৌরী	৮	২১শে মার্চ, ২০১৪	৬,৫০০/-
উত্তর ভারত	হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মুসৌরী, দেরাদুন, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, সারনাথ, বেনারস	১২	২১শে মার্চ, ২০১৪	১০,০০০/-
কাশ্মীর	অমৃতসর, জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	৯ই এপ্রিল, ২০১৪	১৩,০০০/-
সিকিম	গ্যাংটক, ছাঙ্গুলেক, বাবা মন্দির, নামচি, সান্দ্রুপচী, চারধাম, পেলিং, ইয়ুমথাং	৯	৩০শে এপ্রিল, ২০১৪	৮,৫০০/-
হিমাচল	সিমলা- কুফরি- মানালী- রোটাংপাস- কুলু- মনিকরণ	১১	২১শে মে, ২০১৪	১০,০০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

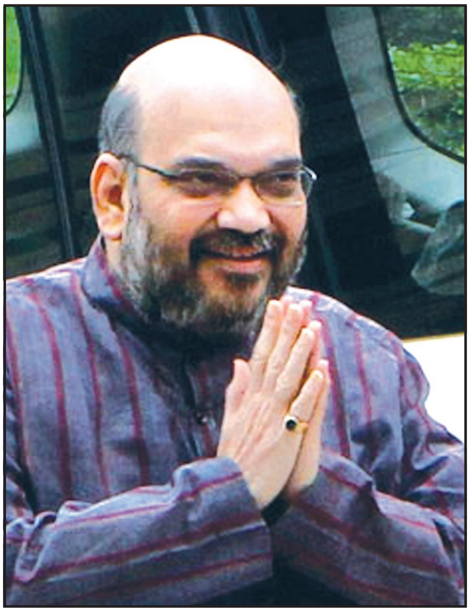

“নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক পুরোনো হিসেব নিকেশের পদ্ধতিই এবার নস্যাৎ হয়ে যাবে।”

সম্প্রতি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার তরফে বিজেপি-র উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোদীর বিশ্বস্ত সেনাপতি অমিত শাহ-র সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তিনি টাইমসের প্রতিনিধিকে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে জানিয়েছেন ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে দিল্লীর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বিজেপি তার ৯০-এর দশকের ফলাফলকেও পেছনে ফেলে দেবে। শাহ বলেন, ৮০ আসন বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপ্রদেশের তখনকার উপর্যুপরি তিনটি নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে দিল্লীর পথে এগিয়ে গিয়েছিল। এবার সে রেকর্ডও ভাঙবে। সেই মূল সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

□ **আচ্ছা, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দিল্লীর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশেই অন্যতম চাবিকাঠি। নানান চ্যানেলের সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষায় উত্তরপ্রদেশে আপনারা ৫০-এর কাছাকাছি আসন দখল করতে চলেছেন। এ ব্যাপারে আপনি পরিস্থিতি কেমন বুঝছেন?**

□ দেখুন, খুব হাত খুলে দেওয়া জনমত সমীক্ষকের হিসেবকেও আমাদের দলের ফলাফল অতিক্রম করবে। বাস্তবে নীচের তলায় জনতার মধ্যে আমাদের দল ও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্রভাইকে নিয়ে উদ্দীপনার স্রোত বয়ে চলেছে সমীক্ষায়। হয়তো কিছুটা ইঙ্গিতমাত্র ধরা পড়ছে। এই ট্রেন্ড যে কোনো অনভিজ্ঞ মানুষেরই নজর এড়াবে না। কিন্তু আসল ফলাফল যখন বেরোবে তখন অনেক নির্বাচনী পণ্ডিতই ঘাবড়ে যাবেন।

□ **জাতপাতের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে থাকা উত্তরপ্রদেশের খ্যাতি বরাবরের। তাই রামমন্দিরের হাওয়া ও বাজপেয়ীর আবেদন ফিকে হয়ে যেতেই বিজেপি এখানে আর সুবিধে করতে পারেনি।**

□ আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা এখনও রাজনীতিকে পুরোনো মাপকাঠিতেই বিচার করতে অভ্যস্ত। চিরাচরিত ফর্মুলায় ফেলে ফলাফলের আন্দাজ করতেই আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। ফলে হয় কি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এবারের নির্বাচন অনেক এই রকম পুরোনো দূরবীণ দিয়ে দেখা চিরাচরিত নজর আন্দাজগুলিকে তছনছ করে দেবে। ২০১৪'র নির্বাচন হতে চলেছে আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশায় ঠাসা এক জনমতের প্রতিফলন। এই নির্বাচনের দুটি প্রতিপক্ষ যেখানে বেছে নিতে হবে নরেন্দ্রভাই মোদীর বারবার পরীক্ষিত উন্নয়নের মডেলটির সঙ্গে শাসক দলের— হাঁপিয়ে পড়া বারবার ফেল হয়ে যাওয়া এক তাঁবাদী মডেলের মধ্যে। নরেন্দ্রভাই-এর মডেল দিশা দেখাচ্ছে এক বলিষ্ঠ সমৃদ্ধ ভারতের। মানুষ এগুলি বিচার করছে। আমি নিশ্চিত তারা পছন্দে ভুল করবে না।

□ **দেখুন ৯০-এর দশকে আপনাদের বিশাল সাফল্যের মূলে ছিল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ও সেরকম উচ্চবর্ণীয় নয় এই দুই শ্রেণীর জোড়া সমর্থন। এই সমর্থনের ভিত্তিই আপনাদের উত্তরপ্রদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে এরা ছেড়ে যাওয়ার ফলেই আপনারাও মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।**

□ আমি আবারও বলছি এই নির্বাচনটি জাতপাতভিত্তিক হবে না। অতীতের ভুল

ভ্রান্তিগুলির কোনো প্রভাব এবার বড় হয়ে দেখা দেবে না। অবশ্যই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে আমাদের সমর্থন বরাবরই কিছুটা সীমিত হলেও তা আমরা কখনই পুরোপুরি হারাইনি। জেনে রাখুন, এবারে তারা আমাদের কাছে আসছে কেননা তারা চোখের ওপর দেখছে এসপি, বিএসপি, কংগ্রেস তিনজনেই শিক্ষাক্ষেত্র ও চাকরির ক্ষেত্র দু' জায়গাতেই মুসলমানদের কোঠা লাগু করার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা আজ ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ। কেননা তারা জানে মুসলমানদের জন্য যে বাড়তি ১৮ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা তাদেরই জন্য সংরক্ষিত মোট ৫০ শতাংশ থেকেই ছেঁটে নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ কখনই করা যাবে না। অর্থাৎ এই ১৮ শতাংশ মুসলিম তাদের ঘাড় ভেঙেই সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তাদের অর্জিত অধিকার থেকে এই ছিনিয়ে নেওয়া তারা মোটেই ভালভাবে নিতে পারছে না।

□ **মানলাম। আপনার জাতি-ভিত্তিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে না। শুধু মুসলিম সংরক্ষণের প্রশ্নেই আপনি মেনে নিতে পারছেন না।**

□ এর কারণ তো খুবই সহজ। কোনো ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক সংরক্ষণ তো সংবিধান-বিরোধী। সংবিধান কেবল পশ্চাদ্‌পদতাকেই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার কথা বলেছে। এটিই মূল ভিত্তিভূমি। সংবিধান কখনই ধর্মকে ভিত্তি করে সংরক্ষণ জারি করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। আর আমাদের প্রাচীন সংবিধান প্রণেতারা এটা করেছিলেন স্বাধীনতা পূর্বের ধর্মভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলীর ভয়ঙ্কর কাজকর্মের পরিণতিকে মাথায় রেখেই।

□ **কিন্তু দেখুন মুসলিমদের মধ্যেও ঠিক হিন্দুদের মতোই সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী রয়েছে যারাও সংরক্ষণের ন্যায্য দাবীদার। এটা আপনি মানেন তো?**

□ আমি আপনার কথার সঙ্গে ১০০ শতাংশ একমত। আর এই প্রসঙ্গে বলি মুসলিমদের এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ইতিমধ্যেই ওবিসি কোটার অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। বিজেপি তাদের ওবিসি কোটায় থাকাতে পূর্ণ সমর্থন করে। আমাদের আপত্তি শুধু ধর্ম-ভিত্তিক সংরক্ষণ চালু করার ক্ষেত্রে। আমি আবার জোরের সঙ্গে বলছি, এই ধরনের সংরক্ষণ সংবিধানের মূল ভাবনার (স্পিরিটের) বিরোধী শুধু নয় তাকে লঙ্ঘন করছে। এই প্রশ্নে আমরা কখনই কোনো আপস করব না।

□ **এখন রাজনীতি বা উত্তর প্রদেশের বাইরে একটা জিজ্ঞাসা আছে। সদ্য ইসরাত জাহান সাজানো সংঘর্ষের মামলায়— অনেক নাড়াচাড়ার পর চার্জশিটে আপনাকে অভিযুক্তের তালিকায় রাখেনি। কেমন মনে হচ্ছে।**

□ আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে আপনার প্রশ্নটা সত্যিই রাজনীতির সঙ্গে আদৌ জড়িত নয়। যাইহোক, তবুও আমি আপনাকে একেবারে নিখাঁজ সত্যি একটা উত্তর দেব। নানান সংবাদ মাধ্যম থেকে আমি জানতে পারছি যে তারা ভাবছে আমি নিশ্চয় এখন খুব স্বস্তি বোধ করছি। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ মজাদার লাগছে— কেননা আমি নিজে, আমার নেতারা, আমার সহকর্মীরা ও আমার দল কেউই কখনও এই অভিযোগকে ন্যূনতম গুরুত্বও দেয়নি। আমি নিজে তো জানি সত্যিটা কি। তার ফলে এ মিথ্যা অভিযোগ আমাকে আদৌ ভাবায়নি। আমি আমার দলের দেওয়া উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব নিয়ে মগ্ন। সেই স্থির লক্ষ্য থেকে কোনো কিছুই আমাকে বিস্মৃত বা স্তিমিত করতে পারবে না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯
Email : banbhoomitravels@gmail.com

হিন্দুকণ্ঠস্বর শোনা যায় না

অমলেশ মিশ্র

আগের লেখায় উল্লেখ করেছি যে ভারতে বা ভারতের বাইরে হিন্দু কণ্ঠস্বর শোনাই যায় না। হাওয়াই (আমেরিকা) থেকে Hinduism Today বলে স্বামীজীদের লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতে এর সমতুল কোনো পত্রিকা পাওয়া যায় না— যদিও ভারতবর্ষ হিন্দুদেরই দেশ।

ভারতীয় জনতা পার্টি-কে Pro-Hindu বা হিন্দুমনা রাজনৈতিক দল বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দলও ভারতব্যাপী কোনো মুখপত্র প্রকাশ করে তাদের বক্তব্য বা মতামত জনসমক্ষে আনতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত অর্গানাইজার পত্রিকাটিও যথেষ্ট প্রচারিত— একথা বলা যায় না। আর বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে তো হিন্দুরা প্রায় অনুপস্থিত।

> ফিজিতে হিন্দুরা রুটিন করে নির্যাতিত হয়, মালয়েশিয়ায় হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। হিন্দুদের মুসলমান করা যাবে (ধর্মান্তর) কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু করা যাবে না। মুসলমান রাষ্ট্রে যে হিন্দুরা কাজ করে, তাদের ধর্ম লুকিয়ে রাখতে হয়।

খোলাচোখে নজর করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষে ১৯৪৭-এর পর থেকে মার্ক্সবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা ব্যাপকতা পেয়েছে এবং ওই দুই মতবাদের মানুষরা হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনকে তাদের প্রধান শত্রু মনে করেছে। হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি তাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত হয়েছে। শুধু মূল্যবোধই ও সংস্কৃতি নয়, হিন্দুত্বের আচার আচরণ এবং পরম্পরাকে এক বিকৃত ব্যাখ্যায় উপস্থিত করেছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এতকাল, প্রায় ১২ শ' বছর হিন্দুত্ব ইসলাম ও খৃস্টানদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেয়েছিল তাদের বীর যোদ্ধাদের পরাক্রমে। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর যখন হিন্দুত্ব মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রের শত্রু হয়ে উঠল তখন তাকে বাঁচিয়ে রেখে প্রভুত্ব করার মতো বীর যোদ্ধাদের পাওয়া গেল না। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের বীর হিন্দু যোদ্ধারা ওদের মোকাবিলা করলেন না তেমনভাবে। ১৯৪৭-এর পর দেখা গেল হিন্দু তাত্ত্বিকরা সেই যুদ্ধ এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং ক্রমাগত পাশ্চ্যায়িত (westernised) এবং হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠছেন। খৃস্টানরা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যে প্রচার সর্বশক্তি দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে করছিল, হিন্দু তাত্ত্বিকরা তাকেই গ্রহণ করতে বা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। রাষ্ট্র-ক্ষমতাধারীদের উপর খৃস্টান ও ইসলামের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। ফলে হিন্দুবিদ্বেষী হিন্দুতাত্ত্বিকরা (Hindu Intellintice) অধিকভাবে সমাদৃত হলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এই মানুষদের হাতেই এল। এমন কোনো রাজনৈতিক দল পাওয়া গেল না— যে এই মহান এবং সর্বপ্রচীন হিন্দু মূল্যবোধ ও হিন্দুত্বকে রাজনীতিতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ভারতের শাসক রাজনৈতিক দলগুলি হিন্দু ধর্মতত্ত্ব হিন্দু দর্শন, হিন্দু মূল্যবোধ এক কথায় হিন্দুত্বকে রক্ষা তো করলই না, উল্টে হিন্দু-বিষয়ক যাবতীয় বিকৃত প্রচার ও অপপ্রচারকে বাধাও দিল না বরং সমর্থন করল। ফলে হিন্দু বিরোধী প্রচার উৎসব কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল না। হিন্দু বিরোধী ও হিন্দুবিদ্বেষী শক্তি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাই দখল করল না, প্রচারমাধ্যম ও উচ্চ শিক্ষালয়গুলিতে তারাই প্রাধান্য পেল। অবস্থা দাঁড়াল এই যে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে, উচ্চাসন পেতে গেলে, শিরোপা পেতে গেলে, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক দখলকারী পেতে হলে— বিন্দুবিদ্বেষ ও বিরোধিতা আবশ্যিক হতে হবে। বিষয়টি আদৌ প্রকাশ্যে এল না বটে তবে মর্মস্থলে থাকল। কালক্রমে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, হিন্দু বা হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতা বোধক হয়ে গেল। হিন্দু বিরোধ ও হিন্দু বিদ্বেষের প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক দলগুলি এবং প্রচারমাধ্যমগুলি একসুরে বাঁধা থাকল। তাদের ল.সা.গু. (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক) যাই-ই হোক তাদের মতামতের গ.সা.গু. (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক) হলো হিন্দু-বিদ্বেষ ও হিন্দু বিরোধিতা। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত এর বিরোধিতায় বা এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামল না, তারা নিজেদের গোষ্ঠী নিয়ে খুশি থাকল, বরং হিন্দু -বিরোধী হিন্দু-বিদ্বেষী রাষ্ট্র শক্তির দাক্ষিণ্য কামনা করল।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার, অন্যথায় এই মহান দর্শন আরও খারাপ অবস্থায় যাবে। এখনই প্রকট যে আগামী প্রজন্ম হিন্দুত্ব সম্পর্কে নির্বিকার এবং উদাসীন। অথচ সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরি করতে হিন্দু দর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শন নেই। তবে এই মোকাবিলা বা হিন্দুত্ব রক্ষার যুদ্ধ গুলি-বারুদ- বন্দুক-মিসাইল-এর যুদ্ধ নয় এবং এর কোনো একটি রণক্ষেত্র নেই। সমস্ত ক্ষেত্রই রণক্ষেত্র এবং এর হাতিয়ার হলো--- সংবাদমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি।

এ কাজটা তাত্ত্বিকদের। যেকোনো তাত্ত্বিক নয়— ক্ষাত্রতেজ যুক্ত তাত্ত্বিক— (Intellectual Kshatriya)। প্রত্যেক সংস্কৃতির একটি তাত্ত্বিক বাহিনী থাকে, যে বাহিনী সেই সংস্কৃতিকে অন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। শুধু নিজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই নয়, তার ভাবমূর্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকে। সেই বুদ্ধিজীবীরা সেই সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ক্ষাত্রতেজ। দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় হলো— হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধিজীবীর বড় অভাব। তাই হিন্দু ও হিন্দুত্ব আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করার যেমন মানুষের অভাব, তার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার মানুষেরও অভাব। প্রচারের যে মূল মাধ্যম--- সংবাদমাধ্যম সেখানে হিন্দু তাত্ত্বিক ক্ষত্রিয় প্রায় নেই বলা যেতে পারে। ফলে বিশ্বব্যাপী হিন্দু-বিরোধী প্রচার কোনো প্রতিরোধ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয় না। বিশ্বের সংবাদ ও প্রচারমাধ্যম হিন্দু প্রসঙ্গকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। যতটুকু বলে তা হিন্দু-বিরোধী— যেমন হিন্দুরা জাতিভেদ মানে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বহু মূর্তির পূজা করে, লিঙ্গপূজা করে, শ্রীকৃষ্ণ একজন রমণীমোহন ইত্যাদি।

সারা বিশ্বে হিন্দু হলো তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম আর তাদের দেশ ভারতবর্ষ হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার কোনো স্থায়ী আসন নেই। পাকিস্তানে হিন্দু বিতাড়ন, বাংলাদেশে হিন্দু বিতাড়ন ও নির্যাতন, মন্দির ধ্বংস, হিন্দু দেবস্থান নির্মাণ প্রভৃতি হিন্দুবিষয়ক প্রসঙ্গগুলি কখনও বিশ্বসভায় আলোচিত হয় না। যদিও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়াদির বিস্তৃত আলোচনা হয়ে থাকে। ফিজিতে হিন্দুরা রুটিন করে নির্যাতিত হয়, মালয়েশিয়ায় হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। হিন্দুদের মুসলমান করা যাবে (ধর্মান্তর) কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু করা যাবে না। মুসলমান রাষ্ট্রে যে হিন্দুরা কাজ করে, তাদের ধর্ম লুকিয়ে রাখতে হয়। সৌদি আরবের কত সাহস যে সে দাবি করে যে আরবে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে মুসলমান হতে হবে। ভারত সরকার সৌদি আরবের সেই দাবিও মেনে নেয়, যদিও ওই আরব দেশের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার ২০ ভাগের এক ভাগ।

ভারতে খৃস্টান মিশনারীরা সদাই ধর্মান্তরকরণে সক্রিয়। যদি আপত্তি করা হয় তাহলেই হিন্দুদের বিপদ। তারা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়, তাদের ধর্মগুরুকে জেলখানায় ভরা হয় অপবাদ দিয়ে। এমনও ঘটনা আছে ক্যাথলিক খৃস্টানপাদরি হিন্দু সাধুসন্তর পোষাক পরে গ্রামে যায়, যোগ-বেদান্তর কথা বলে এবং ধর্মান্তর করায়। (Ref : David Frawley Awaken Bharat P. 27)। ভারতের সংবাদমাধ্যম এসব সংবাদ চেপে যায়। অন্য ধর্মের একজন নিহত হলে চিল-চিৎকার করে আর হিন্দুধর্মের ১০ জন নিহত হলেও সংবাদ হয় না।

এতৎ সত্ত্বেও হিন্দুস্বার্থে অন্তত সত্যের স্বার্থে কোনো হিন্দু কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। বিশ্ব সকাশে হিন্দু নির্যাতনের সংবাদ পৌঁছায় না।

হিন্দু তাত্ত্বিকরা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। প্রচারমাধ্যমের গুরুত্ব তারা বোঝেন না, বুঝলেও সেখানে পৌঁছাতে পারেন না। ভক্ত হিন্দুরা কাপুরুষতা ঢাকতে বলেন— হিন্দু ধর্মকে কেউ নষ্ট করতে, অবলুপ্ত করতে পারবে না। এই আত্মসন্তুষ্টি হলো— কাপুরুষতার অন্য নাম।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

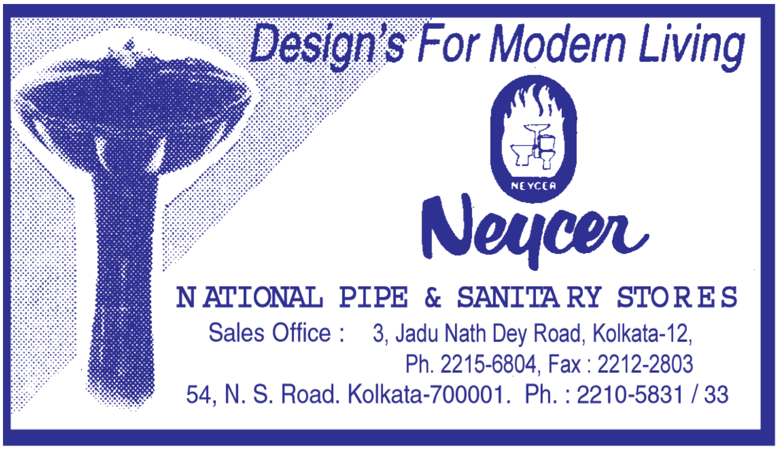

‘যেখানে সুমতি সেখানেই সমৃদ্ধি’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্নবর্তী পরিবারের ভাবনা স্বপ্নের মতো মনে হতে পারে। কিন্তু এখনো এমন অনেক পরিবার আছে যা এই স্বপ্নকে সাকার করে সমাজের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাঁচ বা ছয় নয়, নব্বই সদস্যের পরিবার এক বাড়িতে, একসঙ্গে থাকা-খাওয়া করে যশ, কীর্তি ও উন্নতি করে দেখিয়েছেন প্রয়াগ থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে কোরাঁও মহকুমায় বহরৈচা গ্রামের কেদারনাথ ভুর্তিয়া। তিনি আজও ওই পরিবারে শক্ত খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতায় ভারতের পরম্পরাকে ধরে রেখেছেন।

পরিবারের প্রধান কেদারনাথ ভুর্তিয়া এবার ৯০ বছর পূর্ণ করলেন। তাঁর কথায়— ‘‘আমার শিশুকালেই বাবার মৃত্যু হয়েছে। আমি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মা শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে আমাদের বড় করেছেন। বড় হওয়ার পর আমাকে বাইরের কাজের দায়িত্ব দেন মা।

একসাথে ভুর্তিয়া পরিবার।

সময়ে একে একে সবার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরও আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মতভেদ হয়নি। বাবার ৪৫ বিঘা জমি ছিল। সবাই মিলে জমিতে চাষ করে সংসারের অবস্থা ভাল হতে শুরু করে। মায়ের কথামতো জমি কিনতে কিনতে এখন আমরা ১২৫ বিঘা জমির মালিক।’’ এত বড় পরিবারে সংসারের কাজ, জমির কাজ, গোরু-বাছুর দেখাশোনা ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ইত্যাদি ব্যাপারটা কীভাবে সামলান, প্রশ্ন করে হলে কেদারনাথের ভাই রাজমন বলেন— ‘‘বড় দাদা যাকে যেভাবে কাজ ভাগ করে দেন আমরা সেভাবেই তা পালন করি। যার গোরু-মোষের দায়িত্ব আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থা করে তা গোরু-মোষের চারা, জলের ব্যবস্থা, গোবর সরানো যাই হোক না কেন। যার চাষের দায়িত্ব আছে সেই ঠিক করে কোন জমিতে কখন কি লাগাতে হবে। তার সার, সেচ, ফসল কাটা মারা ও গোলাজাত করা। কেদারনাথকে জিজ্ঞাসা করা হলো— এত বড় একটা ব্যবস্থা চালাচ্ছেন, আপনার পড়াশুনা কতদূর? সলজ্জ হেসে উত্তর দিলেন— প্রথম পাঠশালায় গিয়েই পণ্ডিতমশাই দুই হাতে চার-চার বেত মারেন। ব্যস, পালিয়ে বাড়িতে এসে মাকে বলি, আর পাঠশালায় যাব না? মাটিতেই কাঠি দিয়ে আঁক কষা ও অক্ষর লেখা শিখেছি।’’ কেদারনাথ মায়ের কাছে ছোটবেলায় রামচরিতমানস শুনে শুনে মুখস্ত করেছেন। আজও প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সারার পর কিছু সময় রামচরিতের চৌপাই আউড়ে কাজকর্ম শুরু করেন।

পরিবারে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় কেদারনাথের ভাই রামলখনের ছেলে পুষ্পরাজ বলেন যে তিনি এই পরিবারে বেশি পড়াশুনা করেছেন। বি.এ., এল এল বি. করেছেন। কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব ও বাবা রামলখনের দেখাশুনা করার জন্য ওকালতি করেন না। রামলখন গত ৮ বছর ধরে ‘পার্কিন্সন’ রোগে শয্যাশায়ী। শিবলখনের ছেলে মনোজকুমার বি.এ. বি.এড করে মধ্যপ্রদেশের একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মনোজকুমার এই পরিবারের প্রথম সদস্য যে চাকরি করছে। পুষ্পরাজ বলেন— ‘‘পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্ম পড়াশুনা এক-আধটু করেছে কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পড়াশুনার বিষয়ে খুবই সজাগ। এখন আমাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন শহরে থেকে উচ্চশিক্ষায় পড়াশুনা করছে। মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’’

আয়-ব্যয়ের দায়িত্ব কে আছেন? —প্রথমে এই দায়িত্ব পালন করতো রামলখন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এখন রামজনের ছেলে রাকেশ দেখছে। এই কঠিন দায়িত্ব কীভাবে পালন করেন? রাকেশের উত্তর— কেউ বাজে খরচের জন্য পয়সা চায় না। প্রয়োজন মতো পয়সা দেওয়া হয়।

আধুনিকতার হাওয়ার মধ্যে এই পরিবার প্রণপ্রথা ও বাড়িতে টিভি— দুটোকেই দূরে রেখেছে। পুষ্পরাজের কথায় ভুর্তিয়া পরিবারে প্রণপ্রথার প্রচলন নেই। পরিবারের সবাই পণ নেওয়াকে পাপ মনে করে। ঘরের বউ বড়লোক বা গরিব ঘরের হোক না কেন সবার সম্মান একই। এই পরিবারে কোনো উপহার দেওয়া-নেওয়ার প্রচলন নেই।

খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে পুষ্পরাজ জানালেন, বনভোজনের মতো পরিবেশে বাড়ির মেয়েরা রান্না-বান্না করে। দিনের বেলা এক সঙ্গে খাওয়া হয় না কিন্তু রাতের বেলা পুরুষরা ছোটদের সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে বসে ভোজন করেন, পরে বাড়ির মেয়েরা ভোজন করেন। পরিবারে খাওয়ার বিষয়ে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে না, যা রান্না হয় সবাই তা আনন্দে খেয়ে নেয়।

এত বড় পরিবার এত বছর একসঙ্গে আছে কোন মন্ত্রে— জিজ্ঞাসা করা হলে কেদারনাথ ভুর্তিয়া আবেগভরে বললেন— ‘‘সবাইকে সমান স্নেহভালবাসা, সবার সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেওয়ায় আমরা এক ছাদের তলায় এতজন আনন্দে আছি।’’ তারপর প্রায় সবাই সমস্বরে রামচরিতের চৌপাই সুর করে বললেন— ‘‘জহাঁ সুমতি তহাঁ সম্পত্তি নানা, জহাঁ কুমতি তহাঁ বিপত্তি নিদানা।’’

BE COMFORTABLE AT EVERY STAGE OF LIFE...

Shukr hai, SIP hai...

have it today

INVEST IN SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

SIP helps you to set aside a fixed amount every month for investments, thus contributing towards your financial goals. Through SIP you can start with smaller amount on a monthly basis and create wealth over a long term.

Value of SIP done for 20 years (CAGR)

MONTHLY SIP AMOUNT	INVESTMENT AMOUNT	8%	12%	15%	20%
2,000	4,80,000	11,45,320	18,39,716	26,54,148	49,52,388
3,000	7,20,000	17,17,980	27,59,572	39,81,220	7,428,582
5,000	12,00,000	28,63,300	45,99,287	66,35,367	1,23,80,970

Value of SIP done for 25 years (CAGR)

MONTHLY SIP AMOUNT	INVESTMENT AMOUNT	8%	12%	15%	20%
2,000	6,00,000	18,29,679	34,04,413	55,13,122	1,25,20,534
3,000	9,00,000	27,44,518	51,06,620	82,69,682	1,87,80,801
5,000	15,00,000	45,74,197	85,11,033	1,37,82,804	3,13,01,335

PLAN FOR YOUR UPCOMING EXPENSE TODAY...

Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

"জাতি হিসাবে আমাদের 'নৈতিক ব্যাধিগ্রস্ত' হওয়া উচিত নয়। জাতীয় ভাবধারার মধ্য থেকে সেই ভাবটি খুঁজে বের করতে হবে, যার সহায়ে বিদেশীদের মুখোমুখি হওয়া যাবে।

জাতীয়তার বিশ্বাসী মাত্রেই ভারতকে তরুণ দেখতে হবে। পাঁচ হাজার বৎসরের স্মৃতি বহন করেও সে তরুণ। বস্তুত জগতের সব জাতির মধ্যে ভারতই একমাত্র তপস্বিনীর মতো। তারুণ্যমণ্ডিত, সদা উৎসাহপূর্ণ, সংগ্রামে সদা প্রস্তুত।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ব্রন ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

বয়ঃসন্ধির নানারকম রোগের কথা উঠলে যেটা আমাদের সহজেই মনে পড়ে এবং কমবেশি আমরা প্রায় সকলেই আক্রান্ত হয়েছিলাম কিংবা রাস্তাঘাটে চোখ ফেরালেই দেখতে পাই তা হল ব্রণ (ACNE)।

জীবনের বসন্ত আর ব্রণ যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুন্দর দু'টি গাল ভরে ওঠে ছোট বড় Pimple বা ফুসকুড়িতে, ব্যথা থাকে, মাঝে মাঝে চুলকানি। আর তার ওপর নখের যথেচ্ছাচারে ক্ষত অবধারিত। সঙ্গে নানা রকমের টোটকা এবং অ্যালো-হোমিও-আয়ুর্বেদিকের যাঁতাকলে পড়ে কিশোর-কিশোরীরা ও মাঝে মধ্যে বয়স্করা নাজেহাল হয়ে যায়। তার ওপর নানান শুভানুধ্যায়ীর নিঃশুল্ক পরামর্শ, প্রত্যাশিত ফলের পরিবর্তে-অপ্রত্যাশিত কুফল।

প্রথমেই জানা দরকার এটি বয়ঃসন্ধির রোগ। ব্রণ হচ্ছে সিবেসাস গ্লান্ডের গোলযোগ সংক্রান্ত ত্বকের একটি খুবই প্রচলিত রোগ। সিবেসাস গ্লান্ডগুলো মাথা ও মুখসহ মানব দেহের সর্বত্র চামড়ার নীচে হেয়ার ফলিকল বা কেশগর্ভের গায়ে অবস্থান করে। এরা সিবাম নামে এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ ক্ষরিত করে যা লোমকূপের মাধ্যমে দেহের বাইরে এসে মাথা ও মুখসহ মানবদেহের ত্বককে মসৃণ ও তৈলাক্ত রাখে। কোনো কারণে সিবাম লোমকূপের মাধ্যমে বাইরে আসতে না পারলে ভিতরে জমতে থাকে এবং একসময় তা চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে ওঠে। ফলে চামড়ার উপর ছোটবড় Pimple বা ফুসকুড়ি মতো দেখা যায়, প্রদাহ ও ব্যথা হয়।

এই গুলোকে ব্রণ (ACNE) বলা হয়। তবে অনেক সময় Bacterial infection হয়ে পুঁজও জমে।

লক্ষণানুসারে ব্রণকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) একনি ভালগারিস (ACNE VULGARIS), (২) একনি ইন্ডুরেটা (ACNE INDURATA), (৩) একনি রেজিওলা (ACNE REGIOLA), (৪) একনি টিউবারকুলেটা (ACNE TUBURCULATA)।

সাধারণত ১৩ বছর থেকে ২০-২২ বছর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্রণ দেখা যায়। এরপর ব্রণ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। তবে বেশি বয়সেও অনেকের ব্রণ দেখা যায়। কারণ—

▯ বয়ঃসন্ধিতে ব্রণ জন্মায় মূলত হর্মোন, সিবাস, জীবাণুর গোলযোগের জন্য।

▯ পেটের গোলমাল, কোষ্ঠকাঠিন্য, জল কম খাওয়া, মাসিকের সমস্যা, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন প্রভৃতির জন্য ব্রণ হয়।

▯ জন্মগত কারণ, বংশগত ধারা অনুসারে এই রোগ হতে পারে।

▯ প্রায় রোজ অধিক পরিমাণে মশলাযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের প্রবণতা দেখা যায়।

▯ উত্তেজক বস্তুর সংস্পর্শ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ব্রণ হবার সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া, খেয়াল খুশি মতো বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে নিজেকে সুন্দর করার জান্য অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার ও মেকআপ করা উচিত নয়। এতে ব্রণ আরও বেশি পরিমাণে হতে পারে।

হোমিও চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায় সেগুলি হলো— থুজা, সালফার, আর্নিকা, কেলিব্রোম, নেট্রাম ফস, নেট্রাম মিউর ইত্যাদি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি, রোদ পরিহার করুন। ব্রণ কখনই নখ দিয়ে খোঁটাখুটি করবেন না। তাতে ইনফেকশন ও ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে আর তা থেকেই দীর্ঘস্থায়ী দাগের সৃষ্টি হয়ে সৌন্দর্যহানি ঘটে।

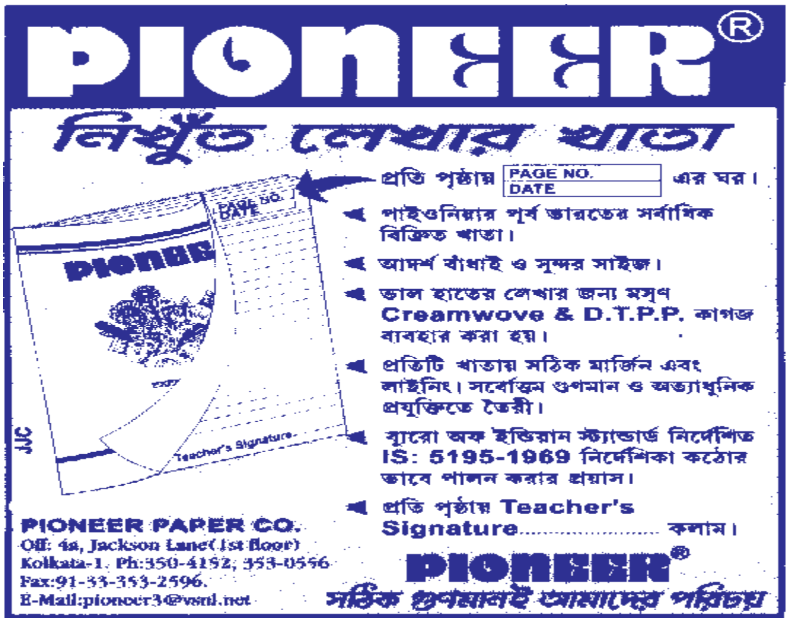

তেজপুরে নবভারত যুবশক্তি সঙ্গম

গত ২৭ জানুয়ারি অসমের তেজপুরে স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তিন দিনের 'নবভারত যুবশক্তি সঙ্গম' শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে অসম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের তিন হাজারেরও বেশি যুবক অংশগ্রহণ করেন।

স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শিবিরের উদ্বোধন করছেন মোহনরাও ভাগবত।

শিবিরের অন্তিম দিবসের ভাষণে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন— স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দু' রকমের উপদেশ দিয়েছেন। এক— সারা বিশ্বের জন্য ও দুই— ভারতবাসীর জন্য। ভারতছাড়া বাকি পৃথিবীর জন্য বলেছেন— অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য অহঙ্কার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার পথে আসতে হবে। ভারতবাসীর জন্য বলেছেন— গৌরবময় অতীত স্মরণ করে আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করে চরিত্রবান হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে। সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষাবিদ ড. অমরজ্যোতি চৌধুরী বলেন— স্বামী বিবেকান্দের চিন্তাধারাকে সারা বিশ্ব গ্রহণ করেছে। আমাদের গর্ব এরকম একজন মহাপুরুষকে আমরা পেয়েছিলাম। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার ভারতীর আসানসোল জেলা শিল্পী সম্মেলন

গত ২৬ জানুয়ারি রবিবার সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের ২৩ তম শিল্পী সম্মেলনের প্রথম পর্ব স্বরূপ এক দিবসীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আসানসোল নিকটবর্তী নীঘা কোলিয়ারি অঞ্চলের এমপিআই বিদ্যালয় ভবনে। দুপুর ২টায় প্রদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু সমবেত শিল্পী সদস্যের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা করেন।

বিকেল ৫টায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, শ্রীপুর বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার সদানন্দ সুমন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা নৃত্যশিল্পী গীতা রায়চৌধুরী। সুমন তাঁর ভাষণে সংস্কার ভারতীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন সংস্কারভারতী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মানুষকে বিশেষ মানুষে পরিণত করে। প্রস্তাবিক বক্তব্য রাখেন নীলাঞ্জনা রায়। সাংস্কৃতিক পর্বে দুর্গাপুর শাখার পরিবেশনায় এবং সমীর কুমার গুপ্তের পরিচালনায় সঙ্গীতালেখ্য প্রশংসনীয়। সঙ্গীত শিল্পী মান্নাদে'র স্মরণে একক সঙ্গীত

সমাবেশ সমাচার

পরিবেশন করেন সমীর কুমার গুপ্ত, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রেয়া দাঁ। নীঘা শাখার শিশু শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের আনন্দদান করে। আসানসোল শাখা ও নীঘা শাখার যৌথ নিবেদন সমবেত দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান উল্লেখনীয়। অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন বিশিষ্ট কার্যকর্তা সৌমেন দাঁ। জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশের অন্যতম সহ সভাপতি আশিস গুপ্ত। সম্মেলনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আসানসোল জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎমল বসু।

সংস্কার ভারতীর নদীয়া জেলা সম্মেলন

গত ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতীর নদীয়া জেলা সম্মেলন নবদ্বীপধাম চাকীপাড়াস্থিত শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির মন্দির প্রাঙ্গণে। সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে ২৩তম সম্মেলনের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন নদীয়া জেলা সম্পাদক ডাঃ বাসুদেব সাহা। পরেশনাথ কুণ্ডুর স্বরচিত কবিতা পাঠ ও রীতা মুখার্জি, অর্চনা ঘোষ, ডলি ভৌমিক, শর্মিলা সাহা'র সঙ্গীত পরিবেশনে সম্মেলন মুখরিত হয়ে ওঠে। বড়জাগুলি শাখার গুরুপদ চন্দ্র পরিবেশিত মাতৃবন্দনা হৃদয় স্পর্শ করে। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বিমল বৈদ। প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু সংস্কারের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সাধনার কথা উল্লেখ করেন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে ৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

নেতাজী সুভাষ জন্মজয়ন্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ১১৮তম

সমাজসেবী জগদীশ প্রসাদ শাহের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজসমর্পিত প্রাণ জগদীশ প্রসাদ শাহের স্মৃতিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বড়বাজারের জৈন ভবনে এক মহতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, হিন্দুস্থান সমাচারের লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, সহপ্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জি, সংস্কারভারতীর বিমল লাঠ, ভারতীয় জনতা পার্টির কিশন ঝাঁওর, গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ নীলমাধব এবং সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখার্জি। মঞ্চস্থ সকলেই জগদীশ প্রসাদ শাহের কার্যকুশলতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। বহু সংস্থার পদাধিকারী ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সহপ্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো নেতাজীর জীবন ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর ঘোষবাদ্য সহ স্বয়ংসেবকরা সকল শুরু করেন। নেতাজী মোড়ে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করেন সমাজসেবী ও সঙ্ঘের শিলিগুড়ি বিভাগ সহ-সঙ্ঘচালক কুলছত্রপ্রসাদ আগরওয়াল।

আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী পালন

গত ২ ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকাল ৫টায় কলকাতায় ১৫১ বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তারূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ‘সংস্কৃতের ওপর ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রীর অবদান ও তার চর্চা’ বিষয়ক এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন কলকাতা ও মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় এবং উপভোক্তা বিষয়কমন্ত্রী সাধন পাণ্ডে।

প্রয়াগে বিশাল সন্ত সম্মেলন

গত ২ ফেব্রুয়ারি তীর্থরাজ প্রয়াগে ত্রিবেণীমার্গস্থিত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমে এক বিশাল সন্ত সম্মেলনের আয়োজন হয়। এতে সারাদেশের অনেক সাধু-সন্ত অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্তর্রাষ্ট্রীয় সংরক্ষক অশোক সিংহল বলেন, দেশে ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে, দেশের সীমার মধ্যে বিদেশী শত্রুরা আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামি জেহাদিরা ভারতে প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাচ্ছে। ড. রামবিলাস বেদান্তি বলেন— দেশে এখন ইউপিএ-র প্রয়োজন নেই। এনডিএ-কে নিয়ে আসতে হবে। সম্মেলনের সমস্ত সাধুসন্তই আগামী লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জিতিয়ে আনার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ির প্রবীণ স্বয়ংসেবক রামকুমার আগরওয়াল গত ৪ ফেব্রুয়ারি বার্ধক্যজনিত কারণে শিলিগুলিতে মিলনপল্লীস্থিত নিজ বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন শিলিগুড়ি নগরের প্রথম শাখার স্বয়ংসেবক। দীর্ঘদিন তিনি সঙ্ঘ, জনসঙ্ঘ, পরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সক্রিয় ছিলেন। দু'বার শিলিগুড়ি পৌরসভার পার্ষদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২০

বাংলা ছবির সাহিত্যে ফেরা

বিকাশ ভট্টাচার্য

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে অমিতাভ বচ্চন যা বলেছেন তা বাংলার সমস্ত ছবি-করিয়েদের ভেবে দেখার মতো। তাঁর বক্তব্যের মূল কথাটা হলো, এক সময় বাংলা সারা ভারতের চলচ্চিত্রকারদের পথ দেখাতো। সাহিত্যনির্ভর বাংলা ছবি সারা ভারতে আদৃত হোত। বাংলা সাহিত্যের হাত ধরে বোম্বাইতেও বহু ছবি হয়েছে। ওই উৎসবেই এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের আর এক সুপারস্টার কমল হাসান। তাঁর কথায় বাংলা সাহিত্য এত সমৃদ্ধ তা সত্ত্বেও বাংলা ছবি কেন দক্ষিণী ছবির রিমেক হবে? তিনি এতে বিস্মিত।

সত্যিই। এক সময় বাংলা ছবি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত বাংলা সাহিত্যের ওপর। কাহিনীর একটা বাঁধুনি থাকায় ছবিও দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করত। তখন মা-মাসীরা বলতেন 'দারুণ একটা বই দেখলাম।' সেই ১৯৩২-এ দেবকী বসু 'চণ্ডীদাস' করলেন। তারপরই শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' ও 'পল্লী সমাজ' এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য অবলম্বনে 'নটীর পূজা'। সালটা ১৯৩৩। এ সবই ম্যাডান থিয়েটার্সের। এরপরই শুরু হলো নিউ থিয়েটার্সের জয়যাত্রা। এখানেও শরৎচন্দ্র। প্রমথেশ বরুয়ার 'দেবদাস' (১৯৩৫) ইতিহাস সৃষ্টি করল। 'ডাক্তার', 'বড়দিদি', 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি' এ সবই তো সাহিত্য নির্ভর। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৬— এই ষোল বছরে প্রায় ২৫০টি ছায়াছবি মুক্তি পেয়েছিল। এর সিংহভাগ ছিল সাহিত্য নির্ভর। অনুরূপা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবীর পারিবারিক কাহিনী বাঙালির মনকে নাড়া দিয়েছিল। এই সময় বেশ কিছু সাহিত্যিক নিজের কাহিনী নিয়ে ছবি পরিচালনাও করেছিলেন। যেমন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় করলেন 'শহর থেকে দূরে', 'বন্দী'। প্রেমেন্দ্র মিত্র করলেন 'হানাবাড়ি'।

স্বাধীনতার পর হেমেন গুপ্ত মনোজ বসুর কাহিনী নিয়ে করলেন 'ভুলি নাই' ও '৪২'— দু'টি ছবিই আজও সমান সমাদৃত। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পর যে সাহিত্যিক বাংলা ছবিতে সর্বাধিক সমাদৃত তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কিশোর সংস্করণের প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি আঁকতে গিয়ে সত্যজিৎ কাহিনীটি পড়ে অভিভূত হন এবং তাকে সেলুলয়েডে রূপ দেন। মুক্তি পায় ২৬ আগস্ট ১৯৫৫। সে এক

'পথের পাঁচালী'-র কয়েকটি দৃশ্য।

ইতিহাস। সত্যজিৎ নিজে আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝেন। চলচ্চিত্র যে পরিচালকের একটা নিজস্ব মাধ্যম তাও জানতেন। তবু এই বিশ্ববরেণ্য পরিচালক তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে বারবার হাত বাড়িয়েছেন বাংলা সাহিত্যের দিকে। রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ, পরশুরাম, তারাশঙ্কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ থেকে শুরু করে শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— কার দিকে হাত বাড়াননি।

এই প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (শক্তিপদ রাজগুরু), 'অযান্ত্রিক' (সুবোধ ঘোষ), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (শিবরাম চক্রবর্তী), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (অদ্বৈত মল্লবর্মন) ছবিগুলির কথাও মনে পড়ে। আসলে যতবড় পরিচালকই হয়ে থাকুন তিনি যদি একটা সাহিত্যকে আশ্রয় করেন— তাহলে তাঁর ছবি দর্শকদের ভালো লাগবেই।

আশার কথা বছর দুয়েক হলো কিছু শিক্ষিত, পরিশীলিত মনের পরিচালক এসেছেন। যাঁরা চলচ্চিত্রে সাহিত্যের অমোঘ প্রভাবের কথা বিশ্বাস করেন। কাহিনীকে সেলুলয়েডে রূপ দিতে নিজের স্বকীয়তাকেও প্রয়োগ করতে পারেন। সম্প্রতি বেশকিছু সাহিত্য-নির্ভর বাংলা ছবি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শকদের আকৃষ্ট করছে। এ প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি, নৌকাডুবি, সত্যান্বেষী, সন্দীপ রায়ের 'যেখানে ভূতের ভয়', গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষ', টনি রায়চৌধুরীর 'অপরিজিতা তুমি', নীতিশ রায়ের 'গোঁসাই বাগানের ভূত', সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'মিশর রহস্য' এবং অনীক দত্তর 'আশ্চর্য প্রদীপ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে শরদিন্দু, সত্যজিতের চারটে গল্প নিয়ে সুটিং করছেন সন্দীপ রায়। বিভূতিভূষণের ধ্রুপদী কাহিনী 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে ছবি করেছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সমরেশ মজুমদারের 'বুনোহাঁস' উপন্যাস চিত্রায়িত করেছেন টনি (অনিরুদ্ধ) রায়চৌধুরি, দুটি ছবিরই মুখ্য ভূমিকায় আছেন দেব। রাজা সেন প্রফুল্ল রায়ের 'খাঁচা' গল্প নিয়ে ফ্লোরে গেছেন। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ নিয়ে কাজ করছেন 'চিটাগাঙ্গ' খ্যাত দিবাকর বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। আসুন, বাংলা ছায়াছবির সাহিত্যে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাই। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' নিয়ে ছবি করছেন সুমন মুখোপাধ্যায়। রাহুল বোস, কঙ্কনা আর স্বস্তিকা অভিনয় করছেন। ✸

শব্দরূপ-৭০৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

					১		২
	৩		৪				
৫			৬				
৭							
				৮			
		৯					
				১০			
১১							

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** উৎস; যেখান হইতে জলক্ষরণ হয়, **৩.** 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা কবি, **৬.** রঘুবংশীয় রাম, **৭.** গীতায় উক্ত জ্ঞানমূলক সাধনাপদ্ধতি—ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায়, **৮.** উত্তর দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ একপ্রকার সরু চাল, **৯.** ছেদন, কর্তন, **১০.** ব্রাহ্মণ বালক, **১১.** রাক্ষসী বিশেষ; মারীচের জননী (রাম কর্তৃক নিহত)।

উপর-নীচ : **১.** বৃষ্ণিবংশীয় পরমভক্ত; শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, **২.** ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বিস্তারিতভাবে, **৪.** অনুরাগ; ঔদাসীন্য, **৫.** জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, বৌদ্ধিমতে দেবীরূপে কল্পিত, **৮.** কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত, অসুর, **৯.** নক্ষত্রবিশেষ, কার্তিক।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০০

		জ	য়	দ্র	থ		দ্বা
পূ	ত	না			ম		র
	বি		গী		ক	ল	কা
	ল	লি	তা			ক্ষ্মী	
	দা			প্র	না	বি	
দা	রি	কা		মা		লা	
ত		লি			ব	স	ন্ত
ব্য		নী	লা	চ	ল		

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭০৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ মার্চ, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

 ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

 যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

 চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

 ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

 পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

 গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

 স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

 লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

 রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

 লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

আপনার একটি ভোট দেশের জন্য আপনার একটি ভোট পরিবর্তনের জন্য

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নির্বাচন সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ এক কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান। নির্বাচনে সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিজের নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবার সুযোগ আসে। এই ধরনের একটি বড় সুযোগ আবার আমাদের সামনে আসতে চলেছে। এই নির্বাচনরূপী অনুষ্ঠানে যত বেশি সংখ্যক ভোট বা মতদান আমরা করতে পারবো গণতন্ত্রও ততবেশি মজবুত হবে ও দেশের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হবে। সুতরাং আগামী নির্বাচনে আপনি নিজে ভোট দিন ও নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ভোট প্রদানে বিশেষ আগ্রহী করুন। আগামী সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের পূর্বে কিছু বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই করা প্রয়োজন যা আমাদের দেশ ও সমাজের সঙ্গে একান্ত সম্পর্কিত।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা : দেশ আজ আতঙ্কবাদ ও মাওবাদের কবলে :

আজ দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিপদগ্রস্ত। জেহাদি সন্ত্রাসবাদী শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। দেশের ভিতর সুরক্ষাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা অধিকাধিক ঘটেই চলেছে। দিকেদিকে শত শত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে চলেছে যার ফলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ হয়েছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দেশব্যাপী তাদের সংগঠনের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান সন্ত্রাসবাদের ঘটনা দিল্লী-মুম্বাই-এর মতো বড় শহরেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়, বরং লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, পাটনা, গয়ার মতো জায়গাতেও ঘটে চলেছে। দেশে বর্তমান ২৭৫টি বেশি জেলা মাওবাদের প্রভাবিত ক্ষেত্র হিসাবে সংবেদনশীল

ভোটদান অবশ্যই করুন
দেশের জন্য ভোটদান করুন

জেলাতে পরিণত হয়েছে। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ও মন্তব্যে প্রকাশ করেছেন যে মাওবাদের সৈদ্ধান্তিক মতবাদ অত্যন্ত ভয়ানক। চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে যে, এই ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সমর্থন তথাকথিত সেকুলারপন্থী মানুষেরাও সমান ভাবে করে চলছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু মন্ত্রী বা সেকুলার পার্টির নেতারাও আছেন। এই ধরনের মানুষজনেরা কখনও কুখ্যাত ভাটকলের মতো সন্ত্রাসবাদীর পক্ষ নেন তো আবার মাওবাদী সিদ্ধান্তের সমর্থনবাদী ধৃত বামপন্থী উগ্রবাদীদেরও জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ওকালতি করেন। কখনও অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য সোচ্চার হন তো আবার কখনও সংসদে দাঁড়িয়ে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের পক্ষ নিয়ে হুমকি দেন। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি এনজিও ও সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে সরকার ও ন্যায়ালয়ের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

ব্যাহ্যিকসুরক্ষা : সংকুচিত সীমা ও নিষ্ক্রিয় সরকার :

দেশের সীমাবর্তী এলাকায় দেশের মানুষই আজ অসুরক্ষিত। স্পষ্ট নীতি ও সবল নেতৃত্বের অভাবে আজ আমরা বাইরের শক্তিসমূহকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারছি না। গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বা ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষুণ্ণ বা কমজোর হয়ে গেছে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় সেনার মাথা কেটে নিয়ে যায়, চীন খোলাখুলি ভাবে বার বার ভারতের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে, মালদ্বীপের মতো ছোট্ট একটা দেশও আমাদের কথা শোনে না। বর্তমান বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা সারা দেশে তিন কোটির অধিক। ওই অনুপ্রবেশকারীরা শুধুমাত্র অসম কিংবা পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, কেরল থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ওইসব অনুপ্রবেশকারীদের রেশন কার্ড ও আধার কার্ড দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির কাজ তথাকথিত সেকুলার পার্টিরাই করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব অনুপ্রবেশকারীদের দায়িত্ব নিতে ও সমস্যার সমাধান করতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি এবং দেশকে ধর্মের নামে বিভাজনের ষড়যন্ত্র :

বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত সীমাই পার করে ফেলেছে। যেমন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর বয়ান— ‘‘দেশের সম্পত্তির উপর প্রথম অধিকার সংখ্যালঘুদের...’’ সরকারের এক মন্ত্রী জিন্নার উক্তিকে সমর্থন করে সংখ্যালঘু সমাজের জন্য আসন

সংরক্ষণের দাবিও পেশ করে। দেশের অনেক স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ফলে যেসব সন্ত্রাসবাদী শত শত মানুষের প্রাণ সংহার করেছে তাদের উপর থেকে মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের অসাংবিধানক দাবি পেশ করা হচ্ছে। মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া শুরু হলে পিছিয়ে পড়া সমাজের সংরক্ষণের মাত্রা স্বাভাবিকভাবে কম হয়ে যাবে। সাচ্চার কমিটি সুপারিশ করছে : পিছিয়ে পড়া অন্য জাতিবর্গের সংরক্ষণ কমিয়ে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। তথাকথিত সেকুলার পার্টির নেতৃত্বে চালিত রাজ্যসরকারগুলিও সময় সময় সাম্প্রদায়িক ভাবনাগুলিকে সুড়সুড়ি দিয়ে থাকে। 'সাম্প্রদায়িক হিংসা বিরোধ'-এর নামে যে আইন বলবৎ হতে চলেছে তা বহুসংখ্যক মানুষকেই আতঙ্কবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার এক ষড়যন্ত্রমাত্র, যা সম্পূর্ণরূপে এক অসাংবিধানিক পদক্ষেপ।

সামাজিক ভারসাম্য ভেঙে চুরমার : অপরাধ ও অরাজকতারই রমরমা :

বর্তমান সরকারের উপর সমাজের আর কোনো বিশ্বাস বাকি নেই। সরকার এমন কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে আমাদের সমাজের ভারসাম্য ভেঙে চুরমার। যে-কোনো ছোট একটি ঘটনা বড় ঘটনার রূপ ধারণ করছে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সদ্‌ভাব হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রে শাসনাধীন সরকারের কাছে ভারতীয় সাধারণ এক ব্যক্তির সামান্য প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত নেই। সমাজের বঞ্চিত ও দলিত বর্গের শোষণ বেড়েই চলছে। তাঁরা দিনে দিনে নিজেদের আরও অধিক অসহায় বলে মনে করছেন। কেন্দ্র সরকারে দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিরা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে, রোজগার বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসবাদকে কাবু করতে অসমর্থ বলে স্বীকার করেছেন মহিলাদের প্রতি অত্যাচার তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে হিংসার প্রভাব। বেড়েই চলেছে। এনজিও এবং রাজনৈতিক ভাবে অরাজকতা সৃষ্টির কাজ অব্যাহত।

আর্থিক স্থিতি ভয়াবহ : সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পূরণ হচ্ছে না :

দেশে আজ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। সর্বসাধারণ জনতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উচিত মূল্যে পেতে অক্ষম। গরিব আরও গরিব হয়েছে, অন্যদিকে আমির আরও আমীর হয়েছে। যুবা সম্প্রদায়ের বেকারত্ব অনেক বেড়েছে, ফলে অসন্তোষও বৃদ্ধি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অরাজক ও হিংসার প্রবৃত্তি। স্পষ্ট নীতির অভাবে ছোট ও লঘু উদ্যোগ আজ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওই সব উদ্যোগের মালিকরা আজ রাস্তায় নেমে চাকুরির সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রেও কোনো স্পষ্ট নীতি নেই। কৃষি ঋণ মুকুব না হওয়ায় দেনার দায়ে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের ছোট ছোট ব্যবসা ও কুটির শিল্প যাতে বন্ধ হয়ে যায় তারজন্য সরকার পরিকল্পিত ভাবে প্রয়াস করে যাচ্ছে। তার জন্য দেশের সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা যাতে বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায় এর প্রয়াস কেন্দ্র সরকার পরিকল্পিত ভাবে করে চলেছে।

'লোকতন্ত্র' থেকে 'লোক' বিলুপ্ত : সর্বত্রই অরাজকতার পরিবেশ :

ভগবান ভরসাতে দেশের সরকার চলছে। শাসনব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গেছে। সরকারকে চালাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কোথা থেকে হচ্ছে কেউ কিছু জানতেই পারছে না। আজ শাসনতন্ত্রে সর্বত্রই ভ্রষ্টাচার দৃষ্টিগোচর। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অত্যন্ত উঁচুস্তর পর্যন্ত এই ভ্রষ্টাচার বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাও এর থেকে বাদ নেই। বিগত কয়েক বছরে নানান ধরনের কেলেঙ্কারির এক বিরাট ঝড় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। দেশের এ পর্যন্ত জ্ঞাত ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহত্তম কেলেঙ্কারি ২-জি কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ্ কেলেঙ্কারি, আদর্শ সোসাইটি কেলেঙ্কারি, হেলিকপ্টার ক্রয় কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি ইত্যাদি এই সরকারের প্রথম কার্যকালের সময়ই ঘটেছে। সরকারের দ্বিতীয় কার্যাবধির সময় কেলেঙ্কারিগুলি এখনও গুনতির বাইরে ও সর্বসমক্ষে এখনও প্রকাশিত হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এইসব কলেঙ্কারির তদন্তের এজেন্সিগুলিই আজ 'সরষের মধ্যে ভূতের' মতো নানান প্রশ্নের মুখোমুখি।

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দায়িত্বশীল সরকার : আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে :

আগত লোকসভার নির্বাচন আপনার কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ। যে নির্বাচনে আপনার ভোট বা মতদান পরিবর্তনের এক জ্বলন্ত শিখা হিসাবে, এক বিরাট পরিবর্তনের বার্তা বহনকারী হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। আগামী নির্বাচনে আমাদেরকে এক শক্তিশালী দায়িত্বশীল, চরিত্রবান, কুশল নেতৃত্ব তথা সমগ্র রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং দায়িত্বশীল এক সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে। এরজন্য আমাদেরকে দেশের শাসনভার এমন হাতে সঁপতে হবে, যারা সুশাসন ও বিকাশের পথে রাজনীতি করবে, যুবকদের রোজগার দিতে দায়বদ্ধ, কিষান ও মজদুরদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। দেশের সীমা ও মা-বোনদের সুরক্ষা দিতে পারে, ইজ্জত বাঁচাতে পারে। দেশের মধ্যে ব্যাপ্ত সন্ত্রাসবাদ ও মাওবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলতে পারে— চাই এমন সরকার। দেশের ১২৫ কোটি জনতাকে এক সমাজ হিসাবে দেখে— চাই এমন সরকার। আমাদের এমন এক সুন্দর সরকার নির্বাচিত করতে হবে যে সরকারের শাসনে একজনও অভুক্ত থেকে রাত্রিযাপন করবে না। একজনেরও মাথা আচ্ছাদনবিহীন থাকবে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সকলের জন্য যাতে সুখকর ও সুলভ হয়।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মাতৃভূমির শাসনভার এমন ব্যক্তিবর্গের হাতে সমর্পণ করি যাঁরা সমর্থ, সমরস, শক্তিশালী, স্বাভিমানী এবং পরমবৈভবশালী স্বপ্নের ভারতকে বাস্তব রূপ দিতে এবং সেইসঙ্গে বিশ্বের দরবারে ভারতমাতাকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

আমরা যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনে মহাপরিবর্তনের পক্ষে হই, তাহলে নিজের ভোটার কার্ডের নম্বর নিম্নলিখিত নম্বরে এস.এম.এস. করুন—০৯২২৩০০৯০০০।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
24 February - 2014